শ্রীদারুব্রহ্ম

অর্থাৎ

সংস্কৃত, উড়িয়া, ও বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত

জগন্নাথদেবের বিবরণ।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত

ও

কলিকাতা, ৪৭ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্ হইতে

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ বি, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,

২১০/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে

শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৩।

মূল্য ||০ আট আনা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থা
সংখ্যা

উৎসর্গ পত্র।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীকরকমলে " শ্রীদারুব্রহ্ম " ভক্তি উপহার স্বরূপ অর্পিত হইল।

বিজ্ঞাপন।

প্রায় দুই বৎসর কাল কোন কার্য্য উপলক্ষে আমি উড়িষ্যায় ছিলাম। সেই সময় অবকাশ মতে বিবিধ স্থান পরিদর্শন ও সেই দেশের পুরাতত্ত্ব বিশেষ যত্নের সহিত সংগ্রহ করিয়া তাহার কোন কোন অংশ ভারতী নামক বিখ্যাত সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ করি। ইচ্ছা ছিল প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ-পূর্ণ উড়িষ্যাদেশের এক খণ্ড ইতিহাস রচনা করিয়া বঙ্গীয় পাঠকদিগের করে সমর্পণ করিব; কিন্তু নানা কারণে সেই অভিলাস পূর্ণ হইয়া উঠিল না। পরিশ্রম করিয়া যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলাম, চিরদিনের জন্য তাহাকে কর্ম্মনাশার জলে বিসর্জ্জন করিতে মনে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। জগন্নাথের বিবরণ উড়িষ্যার ইতিহাসের গৌরবের অধ্যায়, সেইজন্য সেই গৌরবের অধ্যায় বা উড়িষ্যার ইতিহাসের সারাংশ সঙ্কলন করিয়া "শ্রীদারুব্রহ্ম" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। প্রসঙ্গক্রমে আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে উড়িষ্যার ইতিহাসের অনেক ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলাম। এই গ্রন্থের কোন কোন স্থলে আমরা উড়িষ্যাকে কলিঙ্গ নামে পরিচিত করিয়াছি, ইহার কারণ এই, প্রাচীন কালে বাঙ্গালার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্ত হইতে কৃষ্ণাতীর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ কলিঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। উত্তর-কলিঙ্গ হইতেই উড়িষ্যা "উৎকল" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই পুস্তকখানা মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরণ করিয়াই আমি জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ি, সুতরাং পুস্তককে যে আকারে বাহির করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম, তাহা আর এযাত্রা হইয়া উঠিল না। কোনরূপ ত্রুটী লক্ষিত হইলে পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

ক্রোড়পত্র।

৩৮ ও ৩৯ পৃষ্ঠায় নির্ব্বাণ সম্বন্ধীয় টীকার শেষাংশ ভ্রমক্রমে মুদ্রাঙ্কন কালে পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই——

নির্ব্বাণ শব্দের সাধারণ্যে প্রচলিত আভিধানিক অর্থ "নিবিয়া যাওয়া" বা নাশপ্রাপ্ত হওয়া। বৌদ্ধ ধর্ম্মে নির্ব্বাণ শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, অহং অহং—আমি আমি,—এতদ্রূপ জ্ঞান প্রবাহের নাম আলয় বিজ্ঞান; এই আলয় বিজ্ঞান ও "সোঽহং" আত্মা এই উভয়ের মধ্যে কোনরূপ বিভিন্নতা নাই। যোগ সমাধি প্রভাবে চিত্ত বৃত্তির নিরোধ দ্বারা এই বিজ্ঞানধারা যখন একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায়, তখনই আত্মা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। এই মতের নির্ব্বাণ ও আত্মবিনাশ তুল্য কথা। আভিধানিক অর্থের সহিত ইহার সম্পূর্ণ ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয় মতের নির্ব্বাণ দ্বারা আত্মার নাশ হইতে পারে না। অহং জ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বৌদ্ধ-জ্ঞানলাভ (অর্থাৎ বুদ্ধ হওয়া) এই নির্ব্বাণের ফল। ইহাই জীবন্মুক্তি।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১৫	ইহার	ইহাঁর
৭	৪	কোথয়ে	কোথায়
১০	২৭	চতুভুজ	চতুর্ভুজ
১২	২৭	মন্ত্রিকে	মন্ত্রীকে
১৬	২৭	দ্বারুর	দারুর
১৯	১৬ ১৭	কুশসহ্যা	কুশশয্যা
২৮	২২	ইতস্তত	ইতস্ততঃ
৩৫	২৩	যিবুখৃষ্টের	মুসারপ্রচারিত
৩৬	২৬	প্রণোদিতায়	প্রণোদিত হইয়া
৩৮	১৪	ধম্মপদোক্ত নির্ব্বাণ	বৌদ্ধগ্রন্থোক্ত নির্ব্বাণ
৩৯	৩	সঙ্গম্ শরণন্ গচ্ছামি	সঙ্ঘম্ শরণম্ গচ্ছামি
"	২৬	না।	না, কিন্তু
৫৩	১৪	সমকোনযুক্তচতুর্ভুর্জ	সমকোণযুক্তচতুর্ভুর্জ।
"	২৮	তাঁহার	তাঁহাদিগের
বিবিধ স্থানে		সঙ্গ	সঙ্ঘ

কলিকাতা।

শ্রীদারুব্রহ্ম।

বুদ্ধ অবতার।

পৌরাণিক মত।

ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নামাঞ্জন সুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥
শ্রীমদ্ভাগবত। ১। ৩। ২৫ ॥

পুরাণকার ভগবান্ বিষ্ণুর বিবিধ অবতারের বর্ণনা করিয়াছেন। যখন দেবাসুর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে, কিম্বা বিশ্বের কোনরূপ অমঙ্গল ঘটনা হইয়াছে, তখনই ভগবান্ নারায়ন ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সাধারণতঃ বিষ্ণুর দশাবতারই প্রসিদ্ধ, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছেঃ—

“প্রথমতঃ ভগবান্ বিষ্ণু লোক সৃষ্টির নিমিত্ত মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা বিনির্ম্মিত, পঞ্চমহাভূতময়, একাদশেন্দ্রিয় সম্পন্ন পুরুষরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। পুরুষপদ্ম নামক কল্পে যোগনিদ্রা অবলম্বন করত শয়ন করিলে তাহার নাভিহ্রদ হইতে এক পদ্ম জন্মে, সেই পদ্ম হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। পুরুষরূপ বিশুদ্ধ সত্বগুণময়। তাঁহারই অবয়ব-সংস্থান দ্বারা এই জগৎ প্রপঞ্চের উৎপত্তি হইয়াছে। যোগী সকল প্রভূত জ্ঞান দ্বারা সাক্ষাৎকার লাভ করত বলিয়া থাকেন, ভগবানের পুরুষরূপ অসংখ্য অদ্ভুত হস্ত, পদ, মস্তক, কর্ণ, নাসিকা, মৌলি ও কুণ্ডলে ভূষিত। পুরুষাবতার অন্যান্য যাবতীয় অবতারের অক্ষয় বীজ স্বরূপ। ইঁহার ধ্বংস নাই। চরমে সকল অবতারই এই অবতারে বিলীন হয়। ইঁহার অংশ দ্বারা দেবতা, পশু, পক্ষী, ও মনুষ্যাদিরূপ বিবিধ অব-

তারের সৃষ্টি হইয়া থাকে। * যিনি প্রথমতঃ পুরুষরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তিনিই পশ্চাৎ কৌমার নামক সৃষ্টি আশ্রয় করত ব্রাহ্মণরূপে অবতীর্ণ হইয়া সুদুশ্চর ব্রহ্মচর্য্যাচরণ করিয়াছিলেন।

যজ্ঞেশ্বর এই বিশ্বের উৎপত্তি নিমিত্ত বরাহরূপ ধারণ করিয়া জলমগ্না মহীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার দ্বিতীয় অবতার। তৃতীয় অবতারে তিনি দেবর্ষি নারদ রূপে অবতীর্ণ হইয়া, কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার সোপানস্বরূপ বৈষ্ণবতন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন।

চতুর্থ অবতারে ধর্ম্মভার্য্যার গর্ভে তিনি নরনারায়ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া আত্মসংযম করত উৎকট তপস্যা করিয়াছিলেন। পঞ্চম অবতারে সিদ্ধেশ্বর কপিল রূপে অবতীর্ণ হইয়া কালবশে নষ্টপ্রায় নিখিল তত্ত্বের নিশ্চিত্তিসাধন সাংখ্যদর্শন প্রচার করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ অবতার দত্তাত্রেয়, তিনি অনসূয়ার গর্ভে অত্রিপুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়া অলর্ক ও প্রহ্লাদাদিকে আত্মবিদ্যার নিগূঢ় উপদেশ প্রদান করেন। সপ্তম অবতারে রুচি দ্বারা আকূতি গর্ভে যজ্ঞরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে স্বপুত্র যমাদি দেবতার সহিত বিশ্ব পালন করিয়াছিলেন। অষ্টম অবতারে মেরু দেবীর গর্ভে অগ্নীধ্রপুত্র নাভির ঔরষে ঋষভরূপে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বাশ্রমশ্রেষ্ঠ পরমহংস আশ্রমের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। নবম অবতারে পৃথু নামে মনোহররূপে অবতীর্ণ হইয়া ঋষিদিগের প্রার্থনা অনুসারে পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন।

দশম অবতারে চাক্ষুষ নামক মন্বন্তরে জলপ্লাবন হইলে ভগবান্ মৎসরূপ ধারণ করিয়া মৃণ্ময়ী নৌকাতে বৈবস্বত মনুকে রক্ষা করিয়াছিলেন। পুরাকালে দেবাসুরের সমুদ্র মন্থন সময়ে ভগবান্ কূর্ম্মরূপ একাদশ অবতারে, পৃষ্ঠদেশে মন্দর পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন। দ্বাদশ অবতারে ধন্বন্তরি রূপে অমৃতভাণ্ড গ্রহণ করিয়া সমুদ্র গর্ভ হইতে উত্থিত হন। ত্রয়োদশ অবতারে মোহিনীরূপে দেবতাদিগকে সুধাপান করাইয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ অবতারে নৃসিংহ রূপে, রজ্জুনির্ম্মাতা যেরূপ এড়কা বৃক্ষকে বিদারণ করে, তদ্রূপ নখদ্বারা দৈত্যেন্দ্র কশিপুকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ অবতারে বামন রূপে বলি রাজার নিকট ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করিয়া-

* এই পুরুষ অবতারের সহিত একদিকে যেমন ঋগবেদুক্ত-পুরুষসুক্তের-পুরুষের সামঞ্জস্য প্রদর্শিত হইতে পারে, সেইরূপ অপর দিকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিশ্বরূপের অবিকল বর্ণনা বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ছিলেন। ষোড়শ অবতারে ব্রাহ্মণের প্রতি রাজন্যবর্গের বিদ্বেষভাব পরিদর্শন করিয়া পরশুরামরূপে একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। সপ্তদশ অবতারে সত্যবতীর গর্ভে ও পরাশরের ঔরসে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রূপে অবতীর্ণ হইয়া অল্পবুদ্ধি মানবদিগের হিতার্থে বেদ বৃক্ষের শাখা বিস্তার করেন। অষ্টাদশ অবতারে রামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবকার্য্য সাধন অভিলাষে সমুদ্র বন্ধন প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ ও বিংশ অবতারে ভূভার মোচন জন্য রাম কৃষ্ণ রূপে যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তৎপর কলির প্রারম্ভে একবিংশ অবতারে, অসুর-দিগকে মোহিত করিবার জন্য ভগবান্ অঞ্জনপুত্র বুদ্ধ রূপে কীকটদেশে (গয়া) অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অবশেষে কলির অন্তকালে যখন রাজাগণ দস্যুর ন্যায় ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইবে তখন ভগবান্ বিষ্ণুযশা নামক এক ব্রাহ্মণের ঔরসে (দ্বাবিংশতি অবতারে) কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইবেন।"

কিন্তু অন্যান্য পুরাণে কেবল মৎস, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশু-রাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি এই দশ অবতারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক অন্যান্য অবতারের উল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে দেখা যাউক পুরাণ রচয়িতাগণ বুদ্ধ অবতারের কিরূপ বর্ণনা করি-য়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছেঃ—

"পুরাকালে দেবদানব যুদ্ধে দেবগণ পরাস্ত হইয়া ক্ষীরোদ সমুদ্র তীরে গমন পূর্ব্বক নারায়ণের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হন। বিষ্ণু সেই স্তবে তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের নিকট আবির্ভূত হইলেন। তখন দেবগণ প্রণিপাত পুরঃসর বলিতে লাগিলেন; হে ভগবন্! তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, প্রসন্ন হও, দানবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ কর। তাহারা ত্রিলোক জয় ও আমাদের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে। কিন্তু তাহারা স্বধর্ম্ম নিরত, দেবমার্গের অনুগামী ও তপস্যাপরায়ণ, তদ্ধেতু আমরা তাহাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহি। হে ভগবন্! এইক্ষণে আমরা যাহাতে দানবদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হই, তাহার কোন উপায় বিধান কর।

দেবগণের প্রার্থনা শ্রবণান্তর বিষ্ণু আপনার শরীর হইতে মায়ামোহকে উৎপন্ন করিয়া কহিলেন, "এই মায়ামোহ দৈত্যদিগকে মুগ্ধ করিবে এবং তদ্দ্বারা তাহারা দেবমার্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া বধযোগ্য হইবে। আমি বিশ্বপালক, দেব দানব প্রভৃতি যে কেহ ব্রহ্মার বিরোধী হইবে, তাহারা

সকলেই আমার বধার্হ, তোমরা এই মায়ামোহকে অগ্রসর করিয়া গমন কর; ইহার দ্বারা তোমাদের বহু উপকার হইবে।”

মায়ামোহ দেবগণের সহিত প্রস্থান করিয়া দেখিলেন, প্রধান প্রধান দৈত্যগণ তন্মনে নর্ম্মদা তীরে তপস্যায় নিরত আছে। তদ্দর্শনে তিনি বিবস্ত্র, মুণ্ডিত মস্তক ও বর্হিপত্র (ময়ূরপুচ্ছ) ধারণ পূর্ব্বক * তাহাদিগের নিকট গমন করত সুললিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দানবপতিগণ! তোমরা ঐহিক কিম্বা পারত্রিক, কোন্ ফল কামনায় তপস্যা করিতেছ? তাহারা কহিল; পারত্রিক ফল লাভাকাঙ্ক্ষায় আমরা তপস্যায় রত হইয়াছি। কিন্তু তাহাতে তোমার জিজ্ঞাস্য কি? মায়ামোহ বলিলেন, যদি মুক্তি আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে আমার বাক্য গ্রহণ কর। আমি তোমাদিগকে যে ধর্ম্ম উপদেশ করিব, তাহা মুক্তির অবারিত দ্বারস্বরূপ; ও তোমরাই তাহার উপযুক্ত পাত্র। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই। ইহার অনুগামী হইলে নিশ্চয়ই স্বর্গ কিম্বা মুক্তি লাভ হইবে। হে মহাবাহু দৈত্যবৃন্দ! তোমরাই ইহার পরম যোগ্য। এবম্প্রকার বিবিধ প্রলোভন বাক্যবিন্যাস এবং ‘ইহা ধর্ম্মের কারণ ও অধর্ম্মেরও কারণ, ইহা সৎ ও অসৎ, ইহা মুক্তিজনক ও অমুক্তিজনক, ইহা অতি পরমার্থ ও অপরমার্থ, ইহা কার্য্য ও অকার্য্য, ইহা ব্যক্ত ও অব্যক্ত, ইহা বিবস্ত্রের ধর্ম্ম ও বস্ত্রধারীর ধর্ম্ম।’ † এবম্প্রকার বহুবিধ অনেকান্তবাদ প্রদর্শন করিয়া, মায়ামোহ দৈত্যগণকে স্বধর্ম্ম হইতে চ্যুত করিলেন। ‘‘অর্হথেমং মহাধর্ম্ম’’ তোমরা মৎপ্রণীত এই মহাধর্ম্মের যোগ্য হও, মায়ামোহের এই উক্তি প্রযুক্ত সেই ধর্ম্মাবলম্বী দৈত্যগণ “অর্হত” নামে খ্যাত হইল, এবং অন্য দৈত্যগণকেও তাহাদিগের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিল। অল্পকাল মধ্যেই দৈত্যকুল বেদ বিগর্হিত অভিনব ধর্ম্ম পথ অবলম্বন করিল।

---

* এস্থলে প্রকারান্তরে উদারচেতা জৈন উদাসীনদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, কারণ তাহারাই ময়ূরপুচ্ছ বহন করিয়া থাকেন।

† এক বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন কালে এবং ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে এককালে পরস্পর বিরোধী গুণ সংঘটনার সমন্বয় নিমিত্ত জৈনেরা সপ্ত প্রকার ন্যায় স্বীকার করে, তাহার নাম সপ্তভঙ্গনীয়। (শারীরিক ভাষ্য ২ অঃ ২ পাঃ ৩২ সূঃ।) যদিচ বিষ্ণুপুরাণের এস্থলে জৈনদিগের সপ্তভঙ্গীনয়ের অবিকল নির্দ্দেশ নাই, তথাপি প্রতীত হইতেছে যে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই “সৎ ও অসৎ” প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ সপ্ত বাক্য রচিত হইয়াছে। পুরাণকার জৈন ও বুদ্ধদিগকে স্বতন্ত্র বিবেচনা করেন নাই। প্রকৃত পক্ষেও এই উভয় সম্প্রদায় প্রথমতঃ একই ছিল, পরে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সময়ে জৈনেরা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে।

তদনন্তর মায়ামোহ রক্তবস্ত্র পরিধান ও নেত্র অঞ্জন দ্বারা রঞ্জিত করিয়া অন্যান্য অসুরের নিকট গমন পূর্ব্বক মৃদুমধুর বাক্যে কহিলেন, হে অসুরগণ! যদি তোমরা মোক্ষ কিম্বা স্বর্গাদি লাভ আকাঙ্ক্ষা কর, তবে পশুহত্যা ইত্যাদি দুষ্ক্রিয়া দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হইবে না। সমস্ত জগৎ কেবল বিজ্ঞানময়; পণ্ডিতেরাও ইহাই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। অতএব তাহা সম্যক রূপে অবগত হও। জগৎ আধার শূন্য ও ভ্রান্তি জ্ঞানেতেই তৎপর, এবং রাগাদি বশতঃ অত্যন্ত দোষাকর হইয়া সংসার সঙ্কটে ভ্রাম্যমান হইতেছে। * এই প্রকারে বোধ কর, বোধ কর, বোধ কর, এই উক্তি দ্বারা মায়ামোহ দৈত্যদিগকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিলেন।

মায়ামোহ দানবদিগকে যেরূপ নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন, তাহারাও তদনুবর্ত্তী হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে সেই সকল অসুরগণ আবার অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা বেদ স্মৃতি প্রতিপাদ্য সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বেদ, দেবতা, যজ্ঞাদি কর্ম্ম ও ব্রাহ্মণের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইল। হিংসাতে ধর্ম্ম হয়, এ নিতান্ত অনিষ্টজনক বিধি; অগ্নিতে ঘৃত দগ্ধ করিলে ফল লাভ হয়, ইহা বালকের কথা। যজ্ঞেতে পশুবধ করিলে যদি সেই পশুর স্বর্গ লাভ হয়, তবে যজমান স্বীয় পিতাকে কেন বধ করেন না। এবম্প্রকার বহুবিধ

---

* বিষ্ণু পুরাণের টীকাকার "জগৎ কেবল বিজ্ঞানময় ও জগৎ আধার শূন্য" এই দুই বাক্যকে যথাক্রমে যোগাচার ও মাধ্যমিক মতের অভিপ্রায় বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। বেদান্ত দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থে বৌদ্ধদিগের চারিটী প্রধানমত বিবৃত হইয়াছে, যথা— বৈভাষিক সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক। তন্মধ্যে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক মতাবলম্বীগণ বাহ্য বস্তু ও বিজ্ঞান উভয়ই স্বীকার করে, কিন্তু বাহ্য বস্তু ক্ষণিক, যখন প্রত্যক্ষ হয় তখনই তাহার সত্তা থাকে, পরক্ষণেই ধ্বংশ হয়। যোগাচার মতাবলম্বীরা কেবল মাত্র বিজ্ঞান স্বীকার করেন, বাহ্যবস্তু স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে এই জগৎ স্বপ্ন ইন্দ্রজালাদিবৎ দৃষ্ট হইতেছে। যেরূপ স্বপ্ন, ইন্দ্রজাল, মরীচিকাজাল প্রভৃতি বাস্তবিক বাহ্য পদার্থ না হইয়া গ্রাহ্য গ্রাহকরূপে বাহ্য বস্তুর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, জাগরিত অবস্থায় প্রত্যক্ষ স্তম্ভাদিও তদ্রূপ প্রত্যয় হইতে পারে, উভয় স্থলেই প্রত্যয়ের ভিন্নতা নাই। মাধ্যমিক মতে সকলই শূন্য। বেদান্ত দর্শনে যোগাচার মতকে বিজ্ঞানবাদী ও মাধ্যমিক মতকে শূন্যবাদী নামে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

ভোটান্ত দেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের মধ্যে অদ্যাপি এই চতুর্ব্বিধ মতের আলোচনা প্রচলিত আছে। J. A. S. B. Vol. VII. p 143.

উপদেশ দ্বারা মায়ামোহ দৈত্যগণকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করাইলেন। সুতরাং দৈত্যগণ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তখন দেবগণ তাহাদিগকে অনায়াসে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন।”

বিষ্ণু পুরাণের এই উপাখ্যান লক্ষ্য করিয়া অগ্নিপুরাণে লিখিত হইয়াছে যে, দেবাসুরের যুদ্ধে দেবগণ পরাজিত হইলে বিষ্ণু তাঁহাদিগের রক্ষার জন্য মায়ামোহরূপে দৈত্যগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। উক্ত পুরাণে মায়ামোহকে শুদ্ধোদনের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

পুরাণকারগণ বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া ও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মকে ঘৃণার্হ করিবার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন। বৌদ্ধগণ বেদ বিরোধী। সুতরাং বেদভক্ত হিন্দুদিগের সহিত তাঁহাদের যে মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। যাহা হউক আর্য্যসন্তানগণ জগন্নাথ দেবকে ভগবান্ বিষ্ণুর সেই “ঘৃণার্হ” অবতার বলিয়াই স্থির করিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে ঘৃণা ও বিদ্বেষের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে সমস্ত জগদ্বাসী সমস্বরে বলিতেছেনঃ—

অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ।

কোন ধর্ম্মে যে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বীজ লুক্কায়িত আছে, তাহা আমরা জানি না, ইহা যদি দানবের ধর্ম্ম, * তবে দেবতার ধর্ম্ম কি?

---

* এ সমস্তই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ফল। ইহার দ্বিতীয় উদাহরণ আমরা তন্ত্ররত্নাকর হইতে উদ্ধৃত করিতে পারি। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া শাক্ত গ্রন্থকার লিখিয়াছেনঃ—

গণেশ কহিলেন, ত্রিপুরাসুর মহাদেব কর্ত্তৃক হত হইয়া শৈবধর্ম্ম বিনাশের নিমিত্ত তিনপুরের স্থানে গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতরূপে অবতীর্ণ হইল; তৎপর নারীভাবে ভজনার উপদেশ প্রদান করতঃ ব্যভিচারী, ব্যভিচারিণী; ও বর্ণসঙ্করের দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ করিয়া পুনর্ব্বার মহাদেবের ক্রোধানল উদ্দীপ্ত করিল। তাহার সহচর অসুরগণ মনুষ্য বেশ ধারণ করিয়া ত্রিপুরাসুরের তিন অবতারের ভজনা করিতে লাগিল। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মহাপাতকী, অতিপাতকী, উপপাতকী ও অনুপাতকী, অন্য কেহ কেহ সর্ব্বপাপযুক্ত। ইহারা বৈষ্ণব বেশ ধারণ করিয়া সরলহৃদয় ব্যক্তিদিগকে মায়ারূপ তমোজালে জড়িত করিয়াছে।

যাঁহারা প্রেমাবতার ভগবান্ চৈতন্যদেবকেও অসুরের অবতার বলিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা উদার বৌদ্ধধর্ম্মের এরূপ বিকৃত চিত্র পুরাণে অঙ্কিত হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে।

শ্রীদারুব্রহ্ম।

উৎকল দেশীয় মত। *

দেখিলে সিংহাসনোপরে।
বিজয়ে বউদ্ধ রূপরে॥
পাদ অঙ্গুলী নাহি হাত।
শ্রীদারুব্রহ্ম জগন্নাথ॥

দারুব্রহ্ম, ৫অ, ৩২। ৩৩ শ্লোক।

ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে মালব দেশে একরাজা ছিলেন। তিনি পরম বৈষ্ণব। একদা দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রদ্যুম্নের সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, মহারাজ, তুমি বিষ্ণু প্রাপ্ত হইবে এবং জগতে তোমার যশঃ ঘোষণা হইবে। রাজা বলিলেন দেব, বিষ্ণু কোথয়ে আছেন, তাহা বলিয়া দিন। নারদ বলিলেন, তিনি নীলগিরি পর্ব্বতে নীলমাধব রূপে বিরাজ করিতেছেন। জনৈক শবর গোপনে তাঁহাকে পূজা করিতেছে। তৎপর নারদ প্রস্থান করিলে ইন্দ্রদ্যুম্ন চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করিলেন। বিদ্যাপতি নামক জনৈক ব্রাহ্মণ পূর্ব্বদিকে প্রেরিত হইলেন। বিদ্যাপতি না না স্থান ভ্রমণ করিয়া এক দিবস সন্ধ্যাকালে নীলগিরি পর্ব্বত নিবাসী বসু শবরের গৃহে অতিথি রূপে উপস্থিত হন। তিনি তথায় কিছু কাল বাস করিয়াছিলেন। ললিতা নামে শবরের এক যুবতী কন্যা ছিল। শবর বিদ্যাপতিকে সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে অনুরোধ করে। কিন্তু ব্রাহ্মন শবরকন্যার পাণিগ্রহণে অসম্মত হইলেন। তখন শবর ক্রোধে উন্মত্ত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিল, দেখ্ ব্রাহ্মণ, আমার পিতা একটী বাণ দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিয়াছিলেন। আমি কি তোর ন্যায় একটী সামান্য ব্রাহ্মণকে বধ করিতে পারিব না? এই বাক্য শ্রবণে ব্রাহ্মণ ভয়াকুল হইয়া বলিলেন, "তোমার পিতা কি রূপে নারায়ণকে বধ করিয়াছিল, তাহা

* স্কন্দপুরাণান্তর্গত উৎকলখণ্ড অবলম্বনে উড়িয়া ভাষায় লিখিত দারুব্রহ্ম ও ক্ষেত্রপুরাণ নামক দুই খানি গ্রন্থ হইতে এই অধ্যায় সঙ্কলিত হইয়াছে।

আমার নিকট বর্ণন কর; তৎপরে আমি তোমার কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম।"

শবর বলিতে লাগিলঃ—

"কৃষ্ণের মায়ায় দ্বারকায় "কুকুয়াভয়" উপস্থিত হইল। কৃষ্ণ যদু-বংশ সহ সমরাভরণে সজ্জিত হইয়া কুকুয়াবধ করিতে চলিলেন। কুকুয়া যদুবংশ সন্দর্শনে ভয়ে পলায়ন করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসতীরস্থিত কদম্ব বৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, যে, এই বৃক্ষমূলে কুকুয়া লুক্কায়িত রহিয়াছে। বলরাম ক্রোধান্ধ হইয়া সেই বৃক্ষোপরে মুষল প্রহার করিলেন। দারুণ আঘাতে কদম্ব বৃক্ষ হইতে দুগ্ধবৎ নির্যাস বহির্গত হইল। যদুকুলপতি বলিলেন, যাদবগণ, আইস আমরা এই উপাদেয় কাদম্বরী পান করি। তৎপরে সকলই কাদম্বরী পানে উন্মত্ত হইয়া কলহে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে এই আত্মকলহে যদুবংশ ধ্বংশ হয়। বলরাম জলে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ "সিয়লী" লতার মধ্যে শয়ন করিয়া শোক করিতে লাগিলেন।

এই সময় আমার জনক সেই বনে ধনুর্ব্বাণ হস্তে মৃগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। তিনি লতা মধ্যে কৃষ্ণপদ সন্দর্শন করিয়া মৃগকর্ণ জ্ঞানে শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই বাণে কৃষ্ণপদ বিদ্ধ হইল। "হে অর্জ্জুন রক্ষা কর" বলিয়া কৃষ্ণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আমার পিতা নিকটবর্ত্তী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে শরাঘাত দর্শনে ভয় ও বিস্ময়ে একবারে হতচেতন হন। কিঞ্চিৎকাল পরে তিনি চৈতন্য প্রাপ্ত হইলে, নারায়ণ তাঁহাকে বলিলেন, শবর! তুমি ভয় করিও না। পূর্ব্বজন্মে আমি নিরপরাধে তোমার পিতাকে বধ করিয়াছিলাম, অদ্য তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইল। আমার পিতা বলিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বজন্মে কে আমার জনক ছিলেন। নারায়ণ বলিলেন, বালী, তুমি তাহার পুত্র অঙ্গদ।

তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, শবর তুমি হস্তিনায় যাইয়া পাণ্ডবগণকে বল যে, কৃষ্ণ মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। শবর কৃষ্ণের আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। পাণ্ডবগণ এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র শবরের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের দর্শন পাইয়া নানাপ্রকার আক্ষেপ করতঃ অর্জ্জুনের বল হরণ পূর্ব্বক জীবলীলা সম্বরণ করিলেন। তখন পাণ্ডবগণ চিতা নির্ম্মাণ করতঃ কৃষ্ণের দেহ দাহ আরম্ভ করিল। ক্রমে সাতদিবস চেষ্টা করিয়াও পাণ্ডুপুত্রগণ কৃষ্ণের দেহ ভস্ম

করিতে পারিল না। তখন দৈববাণী হইল, হে পাণ্ডবগণ! তোমরা কি পাগল হইয়াছ, অগ্নি কি নারায়ণের দেহ দগ্ধ করিতে পারে? এ দেহপিণ্ড সমুদ্রে নিক্ষেপ কর, কলিযুগে দারুব্রহ্মরূপে নীলাচলে ইঁহার পূজা হইবে। * তদনুসারে পাণ্ডবগণ সেই দেহপিণ্ড সমুদ্রে ভাসাইয়া দিল।"

শবর এই পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া বলিল "আমি সেই শবর পুত্র, তুই আমার কন্যার পাণিগ্রহণ না করিলে নিশ্চয়ই তোকে বিনাশ করিব।"

বিদ্যাপতি কিছুকাল ইতস্ততঃ করিয়া শেষে ললিতাকে বিবাহ করিলেন এবং স্বয়ং তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে ললিতা বুঝিতে পারিল যে তাহার স্বামী সর্ব্বদাই কোন একটী চিন্তায় মগ্ন থাকেন। একদা ললিতা বিদ্যাপতিকে জিজ্ঞাসা করিল, প্রভো! কি জন্য তোমার দেহ দিন দিন মলিন হইয়া যাইতেছে, আমার বোধ হয় কোন চিন্তাব্যাধি তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। তুমি অকপট চিত্তে হৃদয়ের ভাব আমার নিকট ব্যক্ত কর, আমি যথাসাধ্য তাহার প্রতিকার করিব।"

ললিতার বাক্য শ্রবণে বিদ্যাপতি বলিলেন, প্রিয়ে, তুমি সত্য করিয়া বল, তোমার পিতা প্রত্যহ ২।১ দণ্ড রাত্রি থাকিতে কোথায় চলিয়া যান এবং মধ্যাহ্ন কালে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেই সময় তাঁহার শরীর হইতে চন্দনগন্ধ বহিতে থাকে।

ললিতা বলিল "এই সামান্য কথার জন্য তুমি চিন্তা করিতেছ। (নীল-কন্দরে) নীলমাধব বিরাজ করিতেছেন, একথা কেহই জানে না, আমার পিতা গোপনে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। অদ্য আমার জনক গৃহে

---

* বোইলে দেবে স্বর্গে থায়ি। পাণ্ডবে হইলেক বাই॥
অগ্নিরে কাঁহি হেব জুর। ভসাই দিয় সমুদ্রের॥
ভসাই দিয় এবে রজা। কলিযুগরে হেব পূজা॥
শ্রীদারু ব্রহ্মরূপে হরি। নীল গিরিরে বিজে করি॥
সুনি পাণ্ডব পঞ্চ ভাই। সমুদ্রে মেলি দিলে নেই॥
(মাগুনীয়া দাস।)

দেবতারে ডাক দেল্লে আথা স্বর্গে থাই। নিশ্চয় বাই হইলা পাণ্ডব পঞ্চ ভাই॥
সমুদ্রেন মেলি দিয় প্রভু দেবরজা। কলিযুগে হইবে দারুব্রহ্ম পূজা॥
(শিশুরাম দাস।)

আসিলে, আমি তাঁহাকে বলিয়া, তোমাকে কল্য তাঁহার সঙ্গে পাঠাইয়া দিব, তথায় তুমি জগন্নাথ দর্শন করিতে পাইবে।

যথাকালে পিতা গৃহে উপস্থিত হইলে, ললিতা তাঁহার নিকট যাইয়া সকল কথা বলিল। শবর ললিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া ভৎর্সনাসূচক স্বরে বলিল, "তুই কেন ব্রাহ্মণকে দেবতার কথা বলিলি? আমি পুরাণে শ্রবণ করিয়াছি, যে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথকে পূজা করিবেন এক্ষণে বোধ হইতেছে এই ব্রাহ্মণই তাঁহার দূত হইবে, যাহা হউক তোর অনুরোধে আমি ব্রাহ্মণকে জগন্নাথ দর্শন করাইব, কিন্তু তাঁহাকে পথ দেখাইব না, তাঁহার চক্ষুঃ বস্ত্রদ্বারা বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে।"

ললিতা পিতার বাক্যে সম্মত হইয়া পতির নিকট সমস্ত জ্ঞাপন করিল, বস্ত্র দ্বারা চক্ষুঃ বন্ধন করিয়া লইয়া যাইবে, শুনিয়া ব্রাহ্মণ দুঃখিত মনে বলিল "পথ চিনিতে না পারিলে আমার জগন্নাথ দর্শনে কোনও লাভ নাই।"

ললিতা বলিল "তাহার জন্য চিন্তা কি? আমি পথ চিনিবার উপায় করিয়া দিতেছি। তোমার টেঁকে কতগুলি তিল বাঁধিয়া দিব, গমন কালে সেই তিল তুমি পথের দুই পার্শ্বে ফেলিতে ফেলিতে যাইবে। যথাকালে তিলের গাছ হইলে তুমি পথ চিনিয়া লইতে পারিবে।"

তৎপর দিবস প্রত্যুষে বিদ্যাপতি শবরের সহিত অন্ধের ন্যায় জগন্নাথ দর্শন করিতে চলিলেন। বুদ্ধিমতি স্ত্রীর কৃপায় ব্রাহ্মণ পথের দুই পার্শ্বে তিল বুনিতে লাগিলেন, তখন অন্ধকার ছিল, সুতরাং শবর কিছুই জানিতে পারিল না। বনমধ্যে উপস্থিত হইয়া শবর ব্রাহ্মণের চক্ষের বন্ধন খুলিয়া বট-বৃক্ষমূলে নীলমাধব (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দেহপিণ্ড, যাহা পাণ্ডবগণ জ্বালাইতে না পারিয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়াছিল।) মূর্ত্তি দেখাইয়া দিল।

সেই বট বৃক্ষ মূলে বিদ্যাপতিকে বসিতে বলিয়া শবর ফল মূল অন্বেষণে গমন করিল। ব্রাহ্মণ বসিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, দেখিলেন কিঞ্চিৎ দূরে রোহিণী কুণ্ড তীরস্থ এক বৃক্ষ শাখায় ভূষণ্ড কাক নিদ্রা যাই-তেছে; নিদ্রিত কাক ঘুমের ঘোরে বৃক্ষশাখা হইতে রোহিণীকুণ্ডে পড়িয়া গেল এবং পড়িবা মাত্রই কাক চতুর্ভুজ হইয়া উড়িয়া গিয়া চন্দন বৃক্ষে বসিল। তখন বিদ্যাপতি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, কাক কুণ্ডে স্নান করিয়া চতুর্ভুজ হইল, আমিও বোধ হয় এই কুণ্ডে অবগাহন করিলে চতুর্ভুজ হইয়া পাপপূর্ণ পৃথিবী হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া

বিদ্যাপতি কুণ্ডাভিমুখে গমন করিলেন। তখন সেই কাক তাঁহাকে বলিতে লাগিল ? "হে ব্রাহ্মণ! তুমি ইন্দ্রদ্যুম্নের দৌত্যে নিযুক্ত আছ, তাহা কি বিস্মৃত হইলে, তোমার দ্বারা জগন্নাথদেব নরলোকে প্রকাশিত হইবে; তদ্দারাই তুমি কৃতার্থ হইবে।" বিদ্যাপতি কাকের বাক্য শ্রবণে সেই অভিলাষ পরিত্যাগ করিলেন।

এই সময়ে শবর ফল মূল লইয়া তথায় উপনীত হইল, এবং তাহা নীলমাধবের অগ্রে স্থাপন পূর্ব্বক বলিল, "হে প্রভু—জগন্নাথ! ভোজন কর।" শবর এইরূপ বারংবার জগন্নাথকে অনুরোধ করিল, কিন্তু সেই দিবস দেব কিছুতেই আহার করিলেন না। তখন শবর বলিল "প্রভো! কি অপরাধে আমার প্রতি ক্রোধ করিতেছ?"

তখন আকাশ বাণীতে জগন্নাথ শবরকে বলিলেন "রে শবর! তুই পাগল হইয়া ব্রাহ্মণকে এখানে আনিলি কেন? এত দিন তোর নিকট থাকিয়া কন্দমূল ভোজন করিয়াছি। ইন্দ্রদ্যুম্ন আবির্ভূত হইয়াছেন, এক্ষণ আর তোর নিকট থাকিতে পারি না। নীলাচলে যাইয়া দারুব্রহ্মরূপে প্রকাশ হইব, তথায় বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, সুর, অসুর ও নরগণ আমাকে দর্শন করিবে। নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্যে আমার ভোগ হইবে। ব্রহ্মার আয়ুর অর্দ্ধকাল নীলমাধব রূপে ছিলাম। অপরার্দ্ধ দারুব্রহ্মরূপে নীলাচলে বিরাজ করিব।" শবর দৈববাণী শ্রবণে ললাটে করাঘাত পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে বলিল, হায়! হায়! দুহিতা হইতেই আমার সর্ব্বনাশ হইল। এইরূপে কিছুকাল রোদন করিয়া শবর ব্রাহ্মণের চক্ষুঃ বস্ত্র দ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

কিছুকাল গত হইলে সেই তিলের গাছ উঠিল। তখন ব্রাহ্মণ পথ চিনিয়া সর্ব্বদা সেই স্থানে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। স্থানটী বিশেষরূপে পরিচয় করিয়া ব্রাহ্মণ স্বদেশে যাত্রার জন্য ব্যস্ত হইলেন। ললিতা পতির উদ্বিগ্ন ভাব দর্শনে, জিজ্ঞাসা করিল "স্বামিন্! আবার তোমার মনে কেন চিন্তা উপস্থিত হইল।" ব্রাহ্মণ বলিলেন "বহুদিবস গত হইল আমি জন্মভূমি ও আত্মীয়বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, একবার আমাকে শীঘ্রই দেশে যাইতে হইবে।" এই বাক্য শ্রবণে ললিতা নিতান্ত কাতর হইয়া বলিল, "বুঝিয়াছি, পিতা যাহা বলেন তাহাই সত্য; তুমিই রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের দূত। যাহা হউক, আমি পিতাকে বলিয়া তোমাকে দেশে পাঠাইয়া দিব,

তবে আমার এই মাত্র নিবেদন যে, আমাকে পরিত্যাগ করিও না, পিতা আমাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, জগতে তুমিই আমার সর্ব্বস্ব, আমি কখনও তোমার নিকট কোন অপরাধ করি নাই, নির্দ্দোষপত্নীকে পরিত্যাগ করিও না।" বিদ্যাপতি প্রেম-পুলকিত ভাবে কহিতে লাগিলেন "সাধ্বি ললিতে! তুমি আমার কনিষ্ঠা পত্নী, তোমার দ্বারা আমার অনেক কার্য্য হইয়াছে, তোমার কৃপায় আমি জগন্নাথ দেবের দর্শন পাইয়াছি। তোমার কৃপায় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথের পূজা করিতে পাইবেন। তুমি কি পরিত্যাগের উপযুক্তা?" ললিতা পতির বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া, পিতার নিকট গমন করিল এবং বিদ্যাপতিকে দেশে যাওয়ার জন্য বিদায় দিতে শবরকে সম্মত করিল। শবর কন্দমূল লইয়া কিছুদূর ব্রাহ্মণের সহিত গমন করিল; "আকাশ গণ্ডকী" নামক স্থানে শবর বিদ্যাপতিকে কন্দমূল সমর্পণ করিয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

যথাসময়ে বিদ্যাপতি মালব দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলে প্রতিহারী যাইয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিল, "মহারাজ! ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতি আসিয়াছেন, তাহার অঙ্গে শঙ্খ-চক্র-চিহ্ন দেখা যাইতেছে।" রাজা এই সংবাদ শ্রবণে "গোবিন্দ" "গোবিন্দ" উচ্চারণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, বোধ হয়, বিদ্যাপতি প্রভুর দর্শন পাইয়াছেন।

কিয়ৎকালান্তে বিদ্যাপতি রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। রাজা ব্রাহ্মণকে দেখিয়াই বলিলেন, "আপনি কি প্রভুর দর্শন পাইয়াছেন? ব্রাহ্মণ বলিলেন মহারাজ শ্রবণ করুন, আমি ভগবানের দর্শন পাইয়াছি। তিনি বটবৃক্ষ-মূলে নীলমাধব রূপে বিরাজ করিতেছেন। অনতিদূরে রোহিণীকুণ্ড আছে। সেই কুণ্ডে কোটি তীর্থ একত্রিত হইয়াছে এবং স্বচক্ষে দেখিয়াছি ইহার জলে অবগাহন করিয়া কাক চতুর্ভুজ মূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। আমি নিশ্চয়ই দেবরাজের দর্শন পাইয়াছি। ব্রাহ্মণের বচন শ্রবণে রাজা তাঁহার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, আপনিই আমাকে এই দুরূহ বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। তৎপর ব্রাহ্মণকে নানাবিধ ধন রত্ন উপহার প্রদান পূর্ব্বক মন্ত্রিকে বলিলেন "আমি নীলাচলে গমন করিব, তুমি শীঘ্র তাহার আয়োজন কর।"

যাত্রার উপযোগী সমস্ত আয়োজন হইলে তিনি নীলকন্দরে গমন করিলেন। বিদ্যাপতি পথ প্রদর্শন করিয়া চলিল। সেই বট বৃক্ষ-

মূলে উপস্থিত হইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীলমাধব কোথায়," ব্রাহ্মণ দেখিলেন, নীলমাধব ও রোহিণী কুণ্ড তথায় নাই। নারায়ণের মায়ায় তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যাপতি রাজাকে বলিলেন "আমার বোধ হয় বসু শবর তাহা অন্যত্র লইয়া গিয়াছে।" রাজা তখন বসুশবরকে ধৃত করিয়া আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। রাজানুচরগণ শবরপল্লি অভিমুখে ধাবিত হইল। বসু তাহাদের দর্শনে কাতর হইয়া বলিতে লাগিল, হে প্রভু জগন্নাথ! এত কাল তোমার সেবা করিয়া অবশেষে আমাকে এই বিপদে পড়িতে হইল! তখন নারায়ণ আকাশবাণীতে ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিলেন "রাজন্! তুমি অগ্রে যাইয়া নীলাচলে আমার মন্দির নির্ম্মাণ করাও, স্বর্গ হইতে ব্রহ্মাকে আনিয়া সেই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলে তৎপরে তুমি আমার দর্শন পাইবে।"

তখন "বকুলমালা" পর্ব্বত * হইতে রাশি রাশি প্রস্তর খণ্ড সংগৃহীত হইল। কূর্ম্মগণ সেই সকল প্রস্তর পৃষ্ঠে বহন করিয়া আনিয়াছিল। † এবং বৈশাখী পুষ্যা নক্ষত্রাশ্রিত শুক্লা পঞ্চমী গুরুবার মহেন্দ্রলগ্নে মন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইল।

মন্দির প্রস্তুত হইলে ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দেবদূত নারদের সহিত তাঁহার রথে (অর্থাৎ ঢেঁকিতে) আরোহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্! তুমি কি জন্য আমার নিকট আসিয়াছ? রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন। প্রভুর আদেশ মতে নীলাচলে তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছি, এক্ষণে আপনাকে যাইয়া সেই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ব্রহ্মা বলিলেন তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি উপাসনা ও তর্পণাদি কার্য্য সমাধা করিয়া, তোমার সহিত মর্ত্ত্যলোকে যাইয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা করিব। একশতাব্দী অতীত হইয়া গেল। সমুদ্রের জলপ্লাবনে ইন্দ্রদ্যুম্নের নির্ম্মিত মন্দির ক্রমে ক্রমে বালুকা মধ্যে প্রোথিত হইল। রাজা ব্রহ্মার দ্বারে দণ্ডায়মান রহিলেন।

---

* বংশাবলীগ্রন্থে এই পর্ব্বতের নাম "অলূনশালী" লিখিত হইয়াছে।

J. A. S. B. Vol. VI., p. 756.

† কূর্ম্মমানঙ্ক পিঠরে। আনন্তি বহাই পথরে॥

(মাগুনীয়া দাস।)

এদিকে সুদেব, বসুদেব ও শ্রীপতি নামে তিন রাজা গত হইল। মাধব উৎকল রাজাসনে উপবেশনপূর্ব্বক সুখে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি ১৩৭ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। মাধব একদা মকর দশমী দিনে পাত্র মিত্রসহ সমুদ্রে স্নান করিতে যাইতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার অগ্রে অগ্রে যখন রাজানুচরগণ পথ পরিষ্কার করিতেছিল তখন মন্দিরের শীর্ষস্থিত "নীল চক্র" দৃষ্ট হইল। * এই সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হইলে, তিনি তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া সেই স্থান খনন করাইতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল খননের পর দেউল মূল দৃষ্ঠ হইল। রাজা দেউল দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া বিবেচনা করিলেন, বোধ হয় আমার পিতৃ পিতামহ কেহ এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। যাহা হউক আমি ইহাতে দেব-মূর্ত্তি স্থাপন করিব।

ব্রহ্মার তর্পনাদি শেষ হইলে, তিনি ইন্দ্রদ্যুম্নের সহিত রথারোহণে নীলাচলে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া রাজা দেখিলেন তাঁহার নির্ম্মিত মন্দির পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে, ইহার দ্বার দেশে রাজানুচরগণ উপস্থিত থাকিয়া দৌবারিকের কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। কিন্তু ইন্দ্রদ্যুম্ন তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া ব্রহ্মার সহিত মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন দ্বারবান যাইয়া মহারাজ মাধবকে বলিল, "এক জন চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ও এক জন রাজা আপনার আজ্ঞা অবহেলন করিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।"

দৌবারিকের বাক্য শ্রবণে মাধব ক্রোধে অধীর হইয়া তথায় উপনীত হইলেন। এবং ব্রহ্মাও ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিলেন "তোমরা কে; কি জন্য এখানে আসিয়াছ।" ইন্দ্রদ্যুম্ন বলিলেন "মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য আসিয়াছি।" মাধব বলিলেন, "আমি এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছি।" ইন্দ্রদ্যুম্ন বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমি এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলাম, তুমি কেন মিথ্যা কথা বলিতেছ।" ক্রমে মাধব ও ইন্দ্রদ্যুম্নের

* বংশাবলীতে লিখিত আছে রাজা মাধব সর্ব্বদাই সেই মন্দির প্রোথিত স্থানে অশ্ব চালনা করিতেন। একদা তাহার অশ্বপদে সেই মন্দিরের চূড়া (নীলচক্র) বিদ্ধ হইয়া একটী শব্দ উত্থিত হইল। রাজা মাধব ইহার কারণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া সেই স্থান খনন করাইতে লাগিলেন। ক্রমাগত তিন বৎসর তিন মাস খননের পর দেউল মূল দৃষ্টিগোচর হইল।

মধ্যে ঘোর কলহ আরম্ভ হইল। তখন ব্রহ্মা মধ্যবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে তোমাদের কাহার কি সাক্ষী আছে?" মাধব বলিলেন, "আমি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছি তাহার আবার সাক্ষী কি? ইন্দ্রদ্যুম্ন বলিলেন আমার সাক্ষী আছে।

প্রথম সাক্ষী কল্পবটবৃক্ষবাসী "ভূষণ্ড কাক"। ব্রহ্মা বাদী প্রতিবাদীর সহিত কল্পবৃক্ষ মূলে গমন করিলেন। বৃক্ষশাখায় কাককে দর্শন করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন "কাক! তুই সত্য করিয়া বল দেখি এমন্দিব কে নির্ম্মাণ করাইয়াছে।" কাক ব্রহ্মার বাক্যের কোনও উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তখন ব্রহ্মা নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, রে তুচ্ছ কাক! আমার বাক্যের উত্তর দিতেছিস্ না কেন?" ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে কাক বলিল, "তুই কে?" ব্রহ্মা বলিলেন "আমি ব্রহ্মা" কাক বলিল "কি! ব্রহ্মা, এক ব্রহ্মা দেখিয়াছি, তাহার এক সহস্র মুখ ছিল, তার পর শত মুখ ব্রহ্মা বোধ হয় গোটা পঞ্চাশ দেখিলাম, কোটি কোটি ব্রহ্মা গেল আর এল, এই বৃক্ষশাখায় বসিয়া আমি সকলই দেখিলাম; কতবার প্রলয় দেখিলাম, আবার নূতন সৃষ্টি হইল। কিন্তু আমি এই বৃক্ষে বসিয়াই রাম-নাম জপ করিতেছি, তুই সে দিন বিষ্ণুর নাভি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমার প্রতি এরূপে তুচ্ছ বাক্য প্রয়োগ করিতেছিস্।

উপায়ান্তর না দেখিয়া ব্রহ্মা কিছু নরম হইলেন এবং বলিলেন "হে ভাই কাক! তুমি বলিতে পার মন্দির কে নির্ম্মাণ করিয়াছে?" তখন কাক বলিল, ইন্দ্রদ্যুম্ন এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মাধব মিথ্যা কহিতেছে।

রাজা মাধব কাকের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল একটা সামান্য পক্ষীর বাক্যে আমি কখনই মন্দির ছাড়িয়া দিতে পারি না। ব্রহ্মা ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিলেন, তোমার আর কোনও সাক্ষী আছে! তিনি বলিলেন "ইন্দ্র-দ্যুম্ন তালাও" বাসী কূর্ম্মগণ আমার সাক্ষী, তাহারা মন্দিরের প্রস্তর বহন করিয়াছে। তখন ব্রহ্মা কূর্ম্মগণের সাক্ষ্য গ্রহণ জন্য সরোবর তীরে গমন করিলেন। কূর্ম্মগণও ইন্দ্রদ্যুম্নের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিল। ব্রহ্মা মাধবকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়া ইন্দ্রদ্যুম্নকে মন্দির ডিক্রী দিলেন। এবং মাধবকে বলিলেন তুমি মিথ্যা কথা কহিয়াছ অতএব তুমি কলিযুগে "লিঙ্গ" হইয়া থাকিবে; কিন্তু কেহই তোমার পূজা করিবে না। মাধব মিথ্যা কহিয়াছিলেন বলিয়া তিনি "গাল মাধব" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া ইতিহাসে

এই নামেই পরিচিত হইয়াছেন। তৎপর ব্রহ্মা স্বয়ং ইন্দ্রদ্যুম্নের নির্ম্মিত মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

মন্দির প্রতিষ্ঠার পর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন চিন্তা করিতে লাগিলেন যে এক্ষণে কিরূপে দারুব্রহ্মমূর্ত্তি স্থাপন করিতে হইবে। একদা নিশীথ সময়ে নিদ্রিতাবস্থায়, ইন্দ্রদ্যুম্ন নারায়ণের দর্শন পাইলেন, ভগবান্ তাঁহাকে বলিলেন, কল্য তুমি সমুদ্রতীরে গমন করিবে, আমি তথায় বাঁকিমোহনায় দারু ব্রহ্মরূপে তোমাকে দর্শন দিব।

তৎপর দিবস সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে রাজা সমুদ্রতটে উপনীত হইয়া দেখিলেন, ভগবান দারু ব্রহ্মরূপে বাঁকি মোহানায় ভাসিতেছেন।

তখন রাজা শ্রীদারুব্রহ্মকে (অর্থাৎ বৃহৎ একখণ্ড কাষ্ঠ) তীরে উঠাইবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। ইহাতে দড়ি বাঁধিয়া হস্তি ও মনুষ্যগণ টানিতে লাগিল। কিন্তু কোনমতেই দারু স্থানান্তরিত হইল না। রাজা সমস্ত দিন চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইলেন। তিনি রজনীতে গৃহে আসিয়া চিন্তা করিয়া নিদ্রিত হইলেন। আবার নিশীথ সময়ে নারায়ণ তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, "ইন্দ্রদ্যুম্ন! যদি তুমি আমাকে সমুদ্র হইতে আনিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সেই বসুশবরকে আনয়ন কর, তুমি এবং বসু আমাকে মস্তকে লইলেই আমি আসিব।" রাজা প্রাতে শয্যা পরিত্যাগ করিয়াই বসু শবরের জন্য অরণ্যে সেই বিদ্যাপতিকে প্রেরণ করিলেন। যথাসময়ে বিদ্যাপতি বসুশবরকে লইয়া রাজসমীপে উপনীত হইলে। রাজা তাহাকে লইয়া সমুদ্রতীরে গমন করিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন ও বসুশবর দারুকে আকর্ষণ করিবামাত্রেই দারু আসিয়া রথে আরোহণ করিল। রাজা রথ টানিয়া দারু লইয়া চলিলেন, মন্দিরের সম্মুখে গরুড় স্তম্ভ নিকটে উপস্থিত হইয়া তথায় দারু স্থাপন করা হইল।

রাজাজ্ঞায় দ্বাদশ শত সূত্রধর সেই দারু দ্বারা জগন্নাথমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সাত দিবস অন্তে ইন্দ্রদ্যুম্ন দেবমূর্ত্তি কিরূপ প্রস্তুত হইতেছে তাঁহা দেখিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে মূর্ত্তি প্রস্তুত হওয়া দূরে থাকুক দারুর কোনও অংশ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। তথায় সূত্রধরগণ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল মহারাজ এ দারু দ্বারা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা আমাদের অসাধ্য। দেখুন আমাদের অস্ত্র সকল চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, অস্ত্র সকল কোনরূপেই ইহাতে প্রবিষ্ট

হইতেছে না। রাজা সূত্রধরদিগের বাক্য শ্রবণে ভাবিলেন যে ইহারা শঠতা-পূর্ব্বক এরূপ করিতেছে; সুতরাং তিনি আদেশ করিলেন যে আগামী কল্য মধ্যে দেবমূর্ত্তি প্রস্তুত না হইলে সূত্রধরগণের প্রাণদণ্ড হইবে।

সূত্রধরগণ রাজাজ্ঞা শ্রবণে কপালে করাঘাত পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে কাতর ভাবে ঈশ্বরকে বলিল, হে জগন্নাথ! আমরা অনাথ হইয়া তোমাকে ডাকিতেছি, তুমি রক্ষা না করিলে আমাদের প্রাণ রক্ষার আর উপায় নাই।

আর্ত্তজনের আর্ত্তনাদ বিপদভঞ্জনের নিকট উপস্থিত হইল, ভগবান্ আকাশবাণীতে বলিলেন, সূত্রধরগণ! তোমরা নিশ্চিন্ত হও, কল্য প্রাতে আমি রাজার সহিত সাক্ষাত করিয়া তোমাদিগকে রক্ষা করিব।

তৎপর দিবস ভগবান্ নারায়ণ বৃদ্ধ সূত্রধর রূপে নীলাচলে উপস্থিত হই-লেন। তাঁহার দুই পায়ে দুই গোঁদ, পৃষ্ঠে কুজভার, চক্ষে পিচুটী পড়িতেছে, কর্ণে কিছুই শুনিতে পাইতেছেন না। কপালে চন্দনের ফোটা, স্কন্ধে কালসূতা, হস্তে হাতুরা বাটালি লইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছেন এবং বলিতেছেন, কেহ দেব মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইবে কি? বৃদ্ধকারু ক্রমে রাজ-দ্বারে উপনীত হইলেন। কিন্তু প্রহরী তাঁহাকে প্রবেশ করিতে না দিয়া, রাজ সমক্ষে গমন পূর্ব্বক এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল। রাজা সূত্রধরের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে তাঁহাকে স্বসমক্ষে উপস্থিত করিতে আদেশ করিলেন। তদনু-সারে দৌবারিক তাঁহাকে লইয়া রাজসন্নিধানে গমন করিল।

বৃদ্ধকে দর্শন করিয়া রাজা নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। মন্ত্রী বলিলেন মহারাজ! দেখুন, এ ব্যক্তি কবে মরিবে তাহার স্থিরতা নাই, চলচ্ছক্তি প্রায় রহিত হইয়াছে, তথাপি ধনলোভ ছাড়াইতে পারে না! রাজা বৃদ্ধকে বলিলেন, তোমার নাম কি, তুমি কাহার পুত্র, তোমার নিবাস কোথায়, কি কি দেবতা নির্ম্মাণ ও চিত্র করিতে পার। বৃদ্ধ বলিল মহারাজ! আমার শ্রবণশক্তি নিতান্ত লঘু, বড় করিয়া বলুন। রাজা পুনর্ব্বার দীর্ঘ স্বরে সেই সকল কথা উচ্চারণ করিলেন। তখন বৃদ্ধ বলিলেন মহারাজ শ্রবণ করুন; আমার পিতার নাম বাসুদেব মাহারাণা * আমার নাম অনন্ত মাহারাণা, আমি বিশ্বকর্ম্মার গুরু, অসাধ্য সাধন করিতে পারি, আমাকে কেহই গড়িতে পারে না, আমি সকলকেই গড়িতে পারি, আমি আমার মত

* সূত্রধরদিগকে উড়িষ্যায় "মাহারাণা" অপভ্রংশে মা'রাণা বলে।

একটী বৃদ্ধ সূত্রধর গড়িতে পারি, মৎস, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, পরশুরাম বামন, রাম, বলরাম, বুদ্ধ, কল্কি এই দশ অবতার গড়িতে পারি, হে রাজন্! আমি তোমাকে জগন্নাথ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দিব।"

তৎপর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বৃদ্ধ সূত্রধর সমভিব্যাহারে সেই দারুর নিকট উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ দারু দর্শনে ঈষদ্ হাস্য করিয়া নখ দ্বারা দারুর বল্কল উন্মোচন করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাজা তদ্দর্শনে নিতান্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, হে বৃদ্ধ! তুমিই ধন্য! দ্বাদশশত সূত্রধর অস্ত্র দ্বারা যে দারুর কণামাত্র ছেদন করিতে পারে নাই, তুমি নখ দ্বারা তাহা অনায়াসে ছেদন করিতেছ। তখন বৃদ্ধ, রাজাকে বলিল, মহারাজ! তুমি কেন এই সকল সূত্রধরকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, ইহাদিগকে মুক্তকর, ইহারা নন্দী-ঘোষ নির্ম্মাণ করিবে, জগন্নাথ নন্দীঘোষ রথে আরোহণ করিয়া গুণ্ডিচা গৃহে গমন করিবেন, রাজা বৃদ্ধের বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট চিত্তে দ্বাদশ শত সূত্র-ধরকে অব্যাহতি প্রদান করিলেন।

তৎপর বৃদ্ধ বলিলেন, হে রাজন্! আমি মন্দির মধ্যে বসিয়া জগন্নাথ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিব। একবিংশতি রাত্রি মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ থাকিবে। তুমি প্রতিজ্ঞা কর, নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত না হইলে মন্দিরদ্বার কেহ উদ্ঘাটন করিতে পারিবে না। রাজা বলিলেন, আমি সত্য করিতেছি, ২১ রাত্রি পর্য্যন্ত দ্বার রুদ্ধ থাকিবে। কিন্তু একটী কথা, এই একুশ দিন তুমি কি আহার করিয়া জীবন ধারণ করিবে? বৃদ্ধ বলিল রাজন্! ভয় করিও না, আমি কিছু আহার করি না। রাজা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, বৃদ্ধ দারু লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিল, রাজা মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহে গমন করিলেন।

গুণ্ডিচা দেবী রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পট্টমহিষী ছিলেন, তিনি সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন, হায়! জগন্নাথদেব আমার গৃহে কবে আসিয়া বাস করিবেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি একদা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ, সেই দারু দ্বারা কেমন দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইল তাহা তুমি আমাকে দেখাইলে না। রাজা বলিলেন এক বিংশতি দিবসে দেবমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইবে। অদ্য পোনর দিন হইয়াছে, আর ছয় দিবস অপেক্ষা কর, আমি তোমাকে দেব দর্শন করাইব। রাজ্ঞী বলিলেন, দ্বাদশশত সূত্রধর যে দারু ছেদন করিতে সমর্থ হয় নাই, এই বৃদ্ধকারু তাহার কি করিবে, আমার বোধ হয় বৃদ্ধ

অনাহারে মরিয়া গিয়াছে। রাজা রাণীর বাক্য শ্রবণে চিন্তিত হৃদয়ে মন্ত্রীর সহিত মন্দিরদ্বারে গমন করিলেন। রাজা দ্বারে দ্বারে কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও কোন শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল না। রাজা নিতান্ত চিন্তিত হইয়া মন্ত্রীকে বলিলেন, আমার বোধ হয় বৃদ্ধ জীবিত নাই। অতএব আমি দ্বারোদ্‌ঘাটন করিব। মন্ত্রী বলিলেন, মহারাজ! সত্যলঙ্ঘন করিবেন না। রাজা বলিলেন, নিশ্চয়ই বৃদ্ধ জীবিত নাই, জীবিত থাকিলে অবশ্যই "ঠুক্‌ঠাক্" শব্দ শুনা যাইত। রাজা মন্ত্রীর বাক্য অবহেলন করত দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন হস্ত পদ বিহীন জগন্নাথ দেব বৃদ্ধ রূপে সিংহাসনোপরে বিরাজ করিতেছেন।

দেখিলে সিংহাসনোপরে। বিজয়ে বউদ্ধ রূপরে॥
পদ অঙ্গুলী নাহি হাত। শ্রীদারুব্রহ্ম জগন্নাথ॥

রাজা হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া বারংবার দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে প্রভু জগন্নাথ! অদ্য তুমি আমাকে উদ্ধার করিলে। অবশেষে ইন্দ্রদ্যুম্ন মন্ত্রীকে বলিলেন হে মন্ত্রিন্! সেই বৃদ্ধ কারু কোথায় গমন করিল? মন্ত্রী বলিলেন মহারাজ তিনিই জগন্নাথ, তখন রাজা দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া বলিলেন, হায়, হায়, আমি কেন সত্য লঙ্ঘন করিলাম। প্রভু জগন্নাথ এজন্যই আমাকে দর্শন দিলেন না। মন্ত্রিন্! আমি জগন্নাথ সমক্ষে প্রাণ পরিত্যাগ করিব, তুমি কুশসহ্যা রচনা করিয়া দেও। মন্ত্রী তাহাই করিলেন। রাজা কুশসহ্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। ক্রমে অর্দ্ধনিশী গত হইল, ভগবান্ জগন্নাথদেব রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন; হে রাজন! তুমি চিন্তা করিও না, আমি হস্ত পদ বিহীন বুদ্ধরূপে কলিযুগে এখানেই অবস্থান করিব, তুমি স্বর্ণ দ্বারা আমার হস্তপদ নির্ম্মাণ করিয়া দিবে।

মুই বউদ্ধ রূপ হই। কলি যুগরে থিবু রহি॥
সুবর্ণ হাত গোড় করি। গড়াহি দেব দণ্ডধারি॥

রাজা তখন বলিতে লাগিলেন, হে ভগবন! তোমার বিচিত্র মায়া, তোমাতে সকলই সম্ভবে। প্রভো! কে তোমার সেবক হইবে তাহা অনুগ্রহ করিয়া বল। নারায়ণ বলিলেন যে শবর বনে আমাকে পূজা করিত, তাহার পুত্র পশু পালক দইতাপতি আমার সেবক হইবে। তাহার পুত্র পৌত্রাদি সন্তান সন্ততিবর্গ চিরকাল দইতাপতি নামে পরিচিত থাকিয়া

বিধিমতে আমার পূজা করিবে। বলভদ্র গোত্রজ স্থয়ার (শবর) গণ * আমার ভোগের অন্ন ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া দিবে।

জগন্নাথ বলিলেন, হে নৃপতি! তুমি আমার যথার্থ ভক্ত। বর প্রার্থনা কর। তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহাই দান করিব। রাজা বলিলেন, এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তোমার প্রসাদ ছত্রিশবর্ণ জাতিভেদ পরিত্যাগ করিয়া আহার করিবে। কোন প্রকার ভেদ ও উচ্ছিষ্ট জ্ঞান থাকিবে না। বাজারে তাহা বিক্রয় হইবে। সমস্ত দিন তোমার নানাবিধ ভোগ হইবে। জগন্নাথ বলিলেন, তথাস্তু। রাজা বলিলেন আমার আর একটী প্রার্থনা এই যে আমার পুত্র পৌত্রাদি যেন কেহই না থাকে। তোমার মন্দির ও শ্রীমূর্ত্তিকে আমার বলিয়া বলিবার জন্য কেহই এই পৃথিবীতে না থাকুক। জগন্নাথ বলিলেন তাহাই হইবে, দ্বাদশ মাসে পর্ব্বে পর্ব্বে আমার যাত্রা হইবে। মঞ্চোপরে স্নান যাত্রা হইবে। আষাঢ় মাসের দ্বিতীয়াতে গুণ্ডিচা যাত্রা হইবে, নন্দীঘোষ রথে আরোহণ করিয়া গুণ্ডিচা গৃহে গমন করিব, তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিব, পশুপালক (শবর) পাণ্ডাগণ বিধিমত আমার পূজা করিবে।

তৎপর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথ দেবের পূজার সমস্ত নিয়ম ও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

এই সকল ঘটনার অল্পকাল পরেই একটী অচিন্তনীয় ঘটনা উপস্থিত হইল।

রক্তবাহু নামে জনৈক যবন বৃহৎ একদল সৈন্যসংগ্রহ করিয়া অর্ণবপোতারোহণে পুরীর নিকট উপস্থিত হইয়া নঙ্গর করিল। হঠাৎ পুরী নগরে উপস্থিত হইয়া লুণ্ঠন করাই তাহার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু তাহার হস্তী ও অশ্বাদির পুরীষ প্রভৃতি সমুদ্র সলিলে ভাসমান হইয়া তটবাসী মানবদিগের নয়নগোচর হইল। তদ্দর্শনে তাহারা ভয়বিহ্বল হইয়া এই বৃত্তান্ত রাজার কর্ণগোচর করিল। রাজা এই সংবাদ শ্রবণে শ্রীজীউ (জগন্নাথ) মূর্ত্তি ও

---

* স্থয়ার (বা শবর) অর্থাৎ চণ্ডালগণ, অধুনা বলভদ্র গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। ইহারা অদ্যাপি জগন্নাথের রাঁধুনী ব্রাহ্মণের কার্য্য করিতেছে। জগন্নাথের প্রকৃত পূজক ও রাঁধুনী উভয়ই চণ্ডাল জাতীয়, এই সকল অত্যুদার ভাব বৌদ্ধ ব্যতীত হিন্দুতে সম্ভবে না।

তাঁহার রত্নালঙ্কার, তৈজসাদি এক শকটে পরিপূর্ণ করিয়া তৎসহ উড়িষ্যার পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী শোনপুর গোপালী নামক স্থানে পলায়ন করিলেন। যবনরাজ রক্তবাহু সসৈন্যে অর্ণবপোত হইতে অবতরণ করিয়া দেবমন্দির ও নগর লুণ্ঠনপূর্ব্বক দেশবাসীদিগের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে লাগিল। রাজা এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণে নিতান্ত ভয়াকুল হইয়া জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া তদুপরি এক বটবৃক্ষ রোপণ করত অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এদিকে রক্তবাহু ও তাহার অনুচরগণ কিছুকাল নির্ব্বিবাদে উড়িষ্যা অধিকার করিয়া রহিলেন। ক্রমে সমুদ্রের জলপ্লাবনে* ইন্দ্রদ্যুম্নের নির্ম্মিত মন্দির পুনর্ব্বার চিরকালের জন্য ভূগর্ভে সমাহিত হইল।

মাদলা পাঞ্জীর মতে রাজা শিবদেব বা শোভনদেবের শাসনকালে এই ঘটনা হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রের নাম ইন্দ্রদেব। রক্তবাহুর অনুচরগণ দ্বারা ধৃত হইয়া ইন্দ্রদেব অকালে শমনভবন গমন করেন।

---

* রক্তবাহুর আক্রমণ কালে যে জলপ্লাবন হয়, তাহাতেই চিল্কা হ্রদের উৎপত্তি। পুরীর অনতিদূরে সর নামে আর একটী হ্রদ আছে, তাহার উৎপত্তি বৃত্তান্ত জাতীয় ইতিহাস-লেখক লিখেন নাই।

বংশাবলী।

শাক্যসিংহের পিতৃ ও মাতৃকুল।

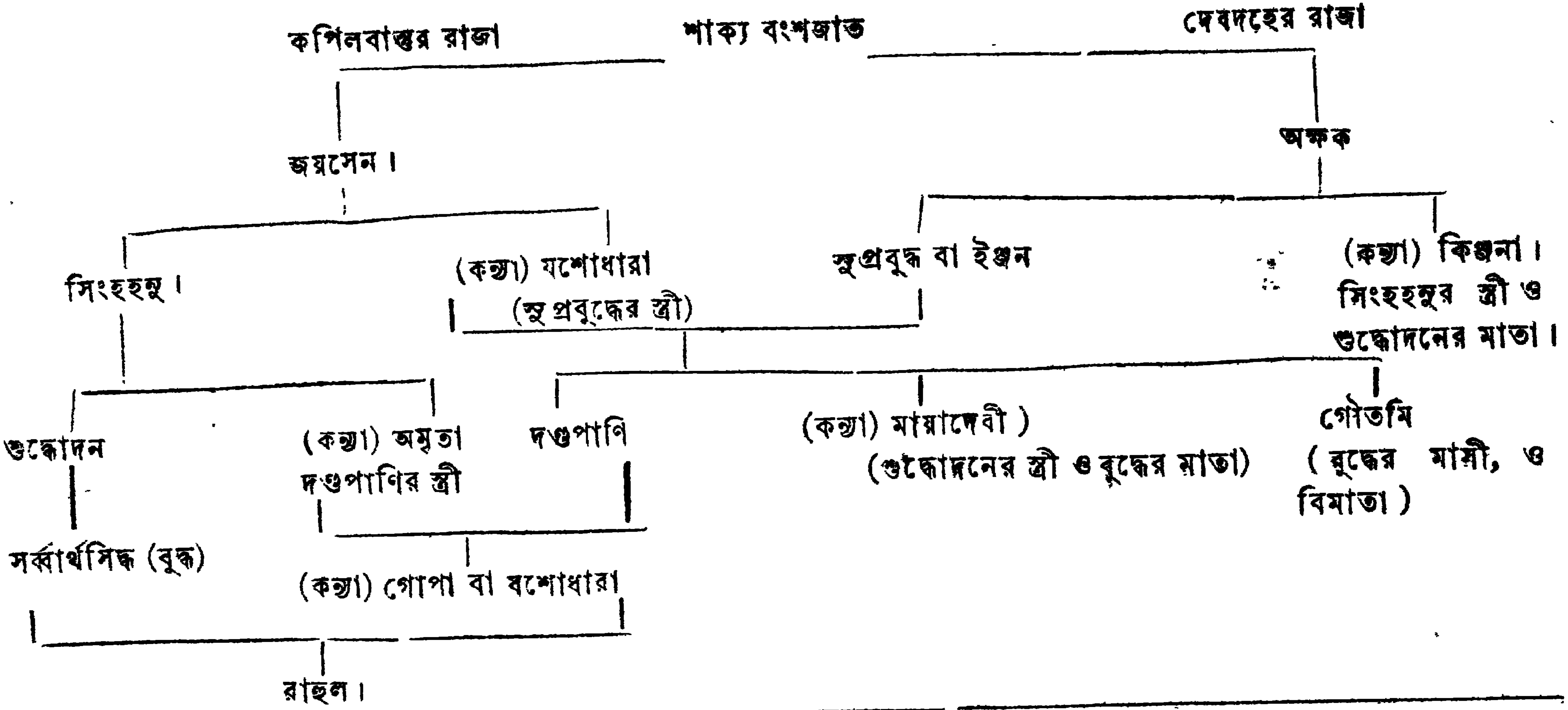

বংশের অন্যান্য ব্যক্তির নাম পরিত্যাগ করা হইল। যে সকল নাম প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাও সকল গ্রন্থে সমান নহে।

বুদ্ধদেব।

বৌদ্ধ গ্রন্থের মত।

অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ।

বৈদিক ধর্ম্মের অধোগতির সহিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ভীষণ অত্যাচারে নিপীড়িত বিনাশোন্মুখ সমাজে পুনঃ সঞ্জীবনী শক্তি প্রদানের নিমিত্তই ভগবান বুদ্ধদেবের আবির্ভাব। সেই সময়ের সমাজচিত্র কি ভীষণ! আর্য্যগণ সোমরস পানে উন্মত্ত হইয়া যজ্ঞ ও উদর পরিতোষের জন্য অবিশ্রান্ত জীবহত্যা করিতেছেন;—নরমেদ অশ্বমেদ প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা পৃথিবীকে জীব রুধিরে অনুরঞ্জিত করিতেছেন। বসুন্ধরা আর পাপভার সহ্য করিতে পারেন না। পৃথিবী টলমল করিতেছে। এই সময় জনৈক অসাধারণ জ্ঞানী মহাপুরুষ আর্য্যাবর্ত্ত প্রদেশে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ।" যে ভীষণ অত্যাচার প্রবল স্রোতস্বতীর ন্যায় আর্য্য সমাজে প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা এক্ষণ বাধা প্রাপ্ত হইল। সামান্য বাধা নহে, মুষ্টিমেয় পাংশু দ্বারা কি প্রবল স্রোতস্বতীর গতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে? অটল-অচল-মহান্ হিমাদ্রিশিখরের ন্যায় "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" সেই সামাজিক-অত্যাচার-স্রোতস্বতীর সম্মুখে দণ্ডায়মাণ হইয়া তাহার গতি পরিবর্ত্তন করিল। যে মহাত্মার হৃদয়ের গভীরতম-দেশ-বিনিসৃত এই মহাবাক্য "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" দ্বারা আর্য্যসমাজে এক প্রকাণ্ড ও মহান্ বিপ্লব সংসাধিত হইয়াছিল, তিনি অসাধারণ জ্ঞানী; এ জন্যই তাঁহার নাম বুদ্ধ।

কোন্ মহাত্মা দ্বারা সর্ব্বপ্রথম এই অত্যুদার মত প্রচারিত হইয়াছিল তাহা স্থির রূপে লিপিবদ্ধ করা সুকঠিন। সাধারণ্যে এইরূপ প্রচারিত আছে যে শাক্যবংশীয় রাজকুমার সর্ব্বার্থসিদ্ধ দ্বারাই এই উদার ধর্ম্মমত প্রচারিত হয়। কিন্তু বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে লিখিত আছে যে বিগত কল্পে এক সহস্র বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কল্পে ও এক সহস্র বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিবেন, তন্মধ্যে চারিজন ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। এই সকল বাক্য কতদুর সত্য তাহা প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা

অবধারণ করা নিতান্ত সহজ নহে, তথাপি যখন আমরা বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে শাক্য সিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৫ জন বুদ্ধের নাম প্রাপ্ত হইতেছি, * তখন সেই সমস্ত কোন মতেই কাল্পনিক বলিয়া অবধারণ করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ গ্রন্থে যখন বৌদ্ধের উল্লেখ রহিয়াছে, তখন শাক্য সিংহকে কোন মতেই আদিবুদ্ধ বলা যাইতে পারে না। শাক্যসিংহ আদি বুদ্ধ না হইলেও তাঁহার সময় হইতেই যে বৌদ্ধ সমাজ সংগঠিত হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রখর জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ হইতে পারে না। মার্টিন লুথারের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ও কোন কোন মহাত্মা অত্যাচারী পোপদিগের প্রতিকূলে দণ্ডায়মাণ হইয়া অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু লুথারই পোপ দিগের অত্যাচার দমন করিয়া প্রটেষ্টান্ট্ সম্প্রদায় গঠন করিতে সক্ষম

*১। পদ্মোত্তর।	২। ধর্ম্মকেতু।	৩। দীপাঙ্কর।
৪। গুণকেতু।	৫। মহাকর।	৬। ঋষিদেব।
৭। শ্রীতেজস।	৮। সত্যকেতু।	৯। বজ্রসংহত।
১০। সর্ব্ববিভু।	১১। হেমবর্ণ।	১২। অত্যুচ্ছগামী।
১৩। প্রবরসাগর।	১৪। পুষ্পকেতু।	১৫। বররূপ।
১৬। সুলোচন।	১৭। ঋষিগুপ্ত।	১৮। জীনাবক্ত্র।
১৯। উন্নত।	২০। পুষ্পিত।	২১। উর্নিতেজস।
২২। পুষ্কর।	২৩। সুরশ্মি।	২৪। মঙ্গল।
২৫। সুদর্শন।	২৬। মহাসিংহতেজস।	২৭। স্থিতবুদ্ধিদত্ত।
২৮। বসন্তগন্ধিন।	২৯। সত্যধর্ম্মবিপুলকীর্ত্তি।	৩০। তিষ্য।
৩১। পুষ্য।	৩২। লোকসুন্দর।	৩৩। বিস্তীর্ণ ভেদ।
৩৪। রত্নকীর্ত্তি।	৩৫। উগ্রতেজস।	৩৬। ব্রহ্মতেজস।
৩৭। সুঘোষ।	৩৮। সুপুষ্প।	৩৯। সুমনোজ্ঞ ঘোষ।
৪০। সুচেষ্টরূপ।	৪১। প্রহসিত নেত্র।	৪২। গুণরাশী।
৪৩। মেঘেশ্বর।	৪৪। সুন্দরবর্ণ।	৪৫। আয়ুষতেজ।
৪৬। সলিল গজগামিন।	৪৭। লোকাভিলষিত।	৪৮। জিতশত্রু।
৪৯। সম্পুজিত।	৫০। বিপশ্চিত।	৫১। শিক্ষী।
৫২। বিশ্বভূ। (বর্ত্তমান কল্পে)	৫৩। ক্রকচচন্দ্র। (১)	৫৪। কঙ্কমুনি। (২)
৫৫। কশ্যপ। (৩)	৫৬। সর্ব্বার্থসিদ্ধ।	

শাক্যসিংহ। (৪)

বর্ত্তমান কল্পের পঞ্চম বুদ্ধ মৈত্রেয় নামে খ্যাত হইবেন।

হইয়াছিলেন। তদ্রূপ বোধ হয় শাক্যসিংহের পূর্ব্বে যাহারা বৈদিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মাণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা বিশেষ ফল লাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে শাক্যসিংহ আবির্ভূত হইয়া বৈদিক অত্যাচারের মূলদেশে কুঠারাঘাত করিলেন। তাঁহার কৃপায় লক্ষ লক্ষ মনুষ্য ও পশুর প্রাণ রক্ষা হইল। তাঁহার যত্নে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সকলে সমভাবে ধর্ম্মের অমৃতোপম উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার অধ্যবসায়গুণে ব্রাহ্মণদিগের অপরিমিত প্রভুত্ব থর্ব্ব হইল, এবং তাঁহারই কৃপায় অত্যাচার নিষ্পেষিত হতভাগ্য শূদ্র জাতি মস্তক উত্তোলন করিতে সক্ষম হইল।

বারাণসী নগরে ইক্ষ্বাকুবংশীয় অক্ষকৃৎ নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি বৃদ্ধবয়সে আপনার কনিষ্ঠা রাজ্ঞীর উত্তেজনায় তদ্‌গর্ভজাত শিশু পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পট্টমহিষীর গর্ভজাত চারিটী জ্যেষ্ঠ পুত্র ও পাঁচটী কন্যাকে নির্ব্বাসিত করেন। এই সকল নির্ব্বাসিত রাজপুত্র ও কুমারীগণ মহর্ষি কপিলের আশ্রমে শাক অর্থাৎ শেগুণ বৃক্ষের নিম্নে কিছু কাল বাস করেন। এই জন্য তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ শাক্য বংশীয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

অযোধ্যা প্রদেশস্থ ফয়জাবাদের প্রায় ৯ ক্রোশ পূর্ব্ব দিকে কপিলবস্তু নামে এক নগরী ছিল। শাক্য বংশীয় রাজা শুদ্ধোদন তথায় রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পট্ট মহিষীর নাম মহামায়া বা মায়াদেবী। ভগবান্ শাক্যসিংহ জম্বুদ্বীপের সমস্ত রাজকুল অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে শাক্যবংশকে নির্দ্দোষ দেখিয়া বাসন্তি পূর্ণিমাতে মায়াদেবীর গর্ভে আবির্ভূত হন। তিনি যৎকালে তুষিতপুর * পরিত্যাগ করিয়া মায়াদেবীর কুক্ষিমধ্যে প্রবেশ করেন তখন রাজ্ঞী এক বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন, দেখিলেন তুষার কিম্বা রজতের ন্যায় ধবলবর্ণ, ষড়দন্তযুক্ত, সুচরণ, চারুভুজ ও সুরক্তশীর্ষ একটী গজ ললিতগতিতে তাঁহার গর্ভে প্রবেশ করিতেছে। রাজ্ঞী এই স্বপ্নদর্শনে অপার আনন্দ লাভ করিয়া স্বামীর নিকট স্বপ্ন বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। রাজা জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণকে স্বপ্ন বিষয়ে প্রশ্ন

* দেবলোক—শাক্যসিংহের স্বর্গীয় নিবাসস্থান। বৌদ্ধদিগের মতে বিষ্ণুর "কামবচরা" নামক স্বর্গের অষ্টম ভবনের মধ্যে তুষিতপুর তৃতীয়, যথা—চতুর্মহারাজ-কায়িকা, ত্রয়স্ত্রিংশা, তুষিতা, যমা, নির্ম্মাণবতী, পরনির্ম্মিতা-বাসবর্ত্তী। T. R. A. S. Vol II. pp. 233-234.

করিলে, তাঁহারা গনণান্তর বলিল, "মহারাজ! সংসারতাপে দগ্ধদেহ প্রাণীমণ্ডলীর একমাত্র শীতল আশ্রয়স্থল স্বরূপ চক্রবর্ত্তিলক্ষণাক্রান্ত আপনার এক পুত্র সন্তান জন্মিবে।" এই সময় আকাশবাণী হইল, নরপতে! ভীত হইও না, মহাত্মা বোধিসত্ব তোমার পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া, তুষিতপুব পরিত্যাগ করিয়া মায়াদেবীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

শালিবাহন নৃপতির অব্দ প্রচারিত হইবার ৭০১ বৎসর পূর্ব্বে (অর্থাৎ এক্ষণ হইতে ২৫০৯ বৎসর পূর্ব্বে) শাক্যকুমার সর্ব্বার্থসিদ্ধ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মায়াদেবীর পিতা কন্যাকে আসন্নপ্রসবা দেখিয়া স্বগৃহে আনাইতেছিলেন। এই সময় পথিমধ্যে এক শালতরু মূলে নির্ব্বিঘ্নে মায়াদেবী সন্তান প্রসব করিলেন। কিন্তু সন্তান প্রসবের সাত দিবস পরেই সাধ্বী মায়াদেবী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। সিদ্ধার্থের প্রতিপালনের ভার তদীয় মাতৃস্বশা অথচ বিমাতা গৌতমীর হস্তে নিহিত হইল। এই সময় হিমালয়নিবাসী মহর্ষি অসিত রাজা শুদ্ধোদনকে বলিয়াছিলেন, মহারাজ! "ভগবান নারায়ণ"* তোমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইনি মহামহিমান্বিত হইবেন। ইনি সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর রাজাধিরাজ সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তী উপাধি লাভ করিবেন, অথবা পবিত্র সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক সিদ্ধকাম হইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধপদবির অবিসম্বাদী অধিকারী হইবেন।

ক্রমে সিদ্ধার্থ বড় হইতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যে বহু বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইলেন। তাঁহার কিছু মাত্র বাল্যকালসুলভ চপলতা ছিল না; অধিকন্তু কখনও বা গভীর চিন্তামগ্ন হইতেন। রাজা এই সকল দর্শনে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া কুমারকে সুখ ভোগানুরক্ত করিতে যত্নবান্ হইলেন। পুত্রের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। সিদ্ধার্থ লোক শিক্ষার নিমিত্ত দার পরিগ্রহণে সম্মত হইয়া বলিলেনঃ—

ব্রাহ্মণীং ক্ষত্রিয়াং কন্যাং বৈশ্যাং শূদ্রাং তথৈব চ।
যস্যা এতে গুণাঃ সন্তি তাং মে কন্যাং প্রবেদয়॥

রাজা পুত্রের প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া নগর মধ্যে প্রচার করিলেন, আমার

* বুদ্ধদেবকে তাঁহার শত্রু ও মিত্রগণ সমভাবে নারায়ণের অবতার বলিয়াছেন। অন্য কোন ধর্ম্ম প্রচারকের অদৃষ্টে এরূপ ঘটে নাই।

পুত্র গোত্র; কুল ও রূপে মোহিত নহেন। তিনি গুণ, সত্য ও ধর্ম্মের অনুরক্ত, অতএব ইহা বিবেচনা করিয়া কন্যা অন্বেষণ কর।

তদনন্তর অন্বেষন দ্বারা (যশোধারা বা) গোপানাম্নী, সর্ব্বগুণসম্পন্না দণ্ডপাণি শাক্যের কন্যা সিদ্ধার্থের অভিলষিত গুণবতী রমণী বলিয়া স্থির হইলেন। ষোড়শবর্ষ বয়ক্রমে শাক্যকুমার তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। * সিদ্ধার্থ যদিচ কিছুকাল দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সংসারে বাস করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি সর্ব্বদা সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। রাজা পুত্রকে সংসারে আবদ্ধ করিবার জন্য বিশেষরূপে যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুই ফল হইল না। সংসারের কশাঘাতে বুদ্ধদেব জর্জ্জরিত হইলেন।

নানা প্রকার দুঃস্বপ্ন দর্শনে রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের জন্য এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া প্রকারান্তরে তাহাকে তথায় অবরুদ্ধ করিলেন।

একদা পিতার আজ্ঞানুসারে তিনি নগরের পূর্ব্ব দ্বার দিয়া বাহির হইয়া সহচরবর্গের সহিত রথারোহণে পুষ্প বাটিকায় যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে এক জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে দর্শন করিয়া সারথিকে ঐ ব্যক্তির তাদৃশ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সারথি কহিল, কুমার এই ব্যক্তি বৃদ্ধ। বৃদ্ধাবস্থায় আমাদিগকে ও জরাক্রান্ত হইয়া ঐরূপ শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইবে।

সারথির বাক্য শ্রবণে কুমার কহিলেন, হায়! আমরা কি মূঢ়! পরিণামে আমাদের দেহের কি অবস্থা হইবে আমরা তাহা একবার ও চিন্তা করি না। সারথে! প্রত্যাবর্ত্তন কর, আমি কুসুম নিকেতনে যাইব না।

অন্য একদিবস কুমার সিদ্ধার্থ দক্ষিণ দ্বার দিয়া নগর হইতে বহির্গত হইতে ছিলেন। পথপার্শ্বে রোগগ্রস্ত জীর্ণদেহ স্বজন পরিত্যক্ত এক ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া সারথিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সারথি কহিল, কুমার! দুরারোগ্য ব্যাধি এ ব্যক্তিকে এরূপ হীনাবস্থাপন্ন করিয়াছে। তদ্‌শ্রবণে কুমারের হৃদয় হইতে গভীর চিন্তার তরঙ্গ উঠিল। বিমর্ষ ভাবে সেই স্থান হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

---

* শাক্যসিংহ তাহার মাতুলকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। (বংশাবলী দেখ) শকাব্দের দশম শতাব্দীতেও আর্য্যদিগের মধ্যে মাতুলকন্যা বিবাহের প্রথা প্রচলিত থাকার প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। শুনা যায় অদ্যাপি মহারাষ্ট্রে এই প্রথা প্রচলিত আছে।

আবার এক দিবস রথারোহণে পশ্চিম তোরণ দ্বারা সিদ্ধার্থ নগর হইতে বহির্গত হইয়া প্রমোদ উদ্যানে গমন করিতে ছিলেন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তির মৃত দেহ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সেই ব্যক্তির স্বজন-বর্গের হাহাকার রব গগণমণ্ডল বিদীর্ণ করিতেছে। সারথিকে জিজ্ঞাসা করিয়া কুমার ইহার তথ্য অবগত হইলেন। তাঁহার হৃদয় বিষাদ কালীমায় গাঢ়তর রূপে আচ্ছন্ন হইল, তিনি সারথিকে বলিলেন, যৌবনের গর্ব্ব বার্দ্ধক্যে চূর্ণ হইবে। ব্যাধি দ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্য লয় প্রাপ্ত হইবে। অল্পকাল মধ্যেই জীবন বিনষ্ট হইবে। কোন্ মূঢ় এই সকল দেখিয়া সাংসারিক সুখে মুগ্ধ থাকিতে ইচ্ছা করে? যদি বার্দ্ধক্য, রোগ যন্ত্রণা ও মৃত্যু এই সংসারে না থাকিত তাহা হইলেই ইহা চিরসুখ নিকেতন হইত। সারথে! প্রত্যাবর্ত্তন কর, আমি সাংসারিক যন্ত্রণা হইতে মুক্তির উপায় অন্বেষণ করিব।

তদনন্তর একদা নগরের উত্তরদ্বারে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রমোদ উদ্যানে গমন করিতেছিলেন। সেই সময় রোগ শোক মুক্ত প্রশান্ত মূর্ত্তি এক ভিক্ষুকে দর্শন করিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সারথে! এ ব্যক্তি কে? সারথি কহিল, "কুমার! এ ব্যক্তি ভিক্ষু, ইনি সাংসারিক বন্ধন ছিন্ন করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হইয়াছেন। ইনি রিপু সমূহকে জয় করিয়া ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবন যাপন করিতেছেন।" কুমার কহিলেন, "সংসারে ইনিই সৎ ও সুখী। বুধগণের এই পথাবলম্বন করাই কর্ত্তব্য, আমি এই পথই অবলম্বন করিব এবং অন্যান্য সকলকেই এই মার্গাবলম্বনে প্রণোদিত করিব। ইহা দ্বারাই আমাদের জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে।" জগত পূজ্য সিদ্ধার্থের গাঢ়তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বিক্ষিপ্ত হইল। সাংসারিক কশাঘাতে যে হৃদয় অস্থির হইয়া ইতস্তত ছুটাছুটি করিতেছিল, আজ সেই হৃদয় একটি আলোকপূর্ণ পুণ্যময় পথ দেখিতে পাইল এবং জগতের জন্য সেই জ্যোতিঃপূর্ণ পুণ্যময় পথের দ্বার মুক্ত করিতে বদ্ধ পরিকর হইল। সিদ্ধার্থ সেই স্থান হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের সংসার বৈরাগ্য দর্শনে ক্রমেই বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। পুত্রকে সুখী করিবার জন্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সিদ্ধার্থ বলিতে লাগিলেন জরা দ্বারা যে যৌবন আক্রান্ত হইবে সেই যৌবনে ধিক্, ব্যাধি

দ্বারা যে আরোগ্য পরাহত হইবে, সেই আরোগ্যে ধিক্, মৃত্যু দ্বারা যে জীবন আক্রান্ত হইবে সেই জীবনে ধিক্!

কুমার সর্ব্বার্থসিদ্ধ বলিলেন, যদি সংসারে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু না থাকিত তাহা হইলেও পঞ্চস্কন্ধ * জনিত মহাদুঃখ হেতু আমি সংসার পরিত্যাগ করিতাম, কিন্তু যখন জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু নিশ্চয়ই জীবনকে আয়ত্ত করিবে তখন এই সকল দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ জন্য উপায়াবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

একদা রজনীতে কুমার সর্ব্বার্থসিদ্ধ পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া সংসার পরিত্যাগ জন্য বিদায় প্রার্থনা করিলেন। †

পুত্র বলিলেন পিতঃ! আমার সংসার পরিত্যাগের সময় উপস্থিত হইয়াছে, অনুমতি প্রদান করুন, আমাকে আর বাধা দিবেন না, শোক পরিত্যাগ করুন, আমাকে ক্ষমা করুন।

রাজা অশ্রুজলে বদনমণ্ডল প্লাবিত করিয়া বলিলেন, বৎস! সংসার পরিত্যাগ করিয়া কি লাভ হইবে? যাহা অভিলাষ, প্রার্থনা কর, এক্ষণই পূর্ণ করিব। রাজবংশের প্রতি সদয় হও। আমার প্রতি সদয় হও। রাজ্যের প্রতি সদয় হও।

কুমার বলিলেন প্রভো! আমি চারিটী বর প্রার্থনা করিতেছি, প্রদান করুন, তাহা হইলে আমি কখনই গৃহ পরিত্যাগ করিব না। আপনি সর্ব্বদা আমাকে দেখিতে পাইবেন।

হে দেব! আমি ইচ্ছা করি যেন, জরা দ্বারা আমি কদাপি আক্রান্ত না হই, এবং যৌবনের রূপলাবন্য যেন সমভাবে চিরকাল থাকে। আমার স্বাস্থ্য যেন চিরকাল অক্ষুন্ন থাকে, কোন রোগ দ্বারা যেন ক্লিষ্ট না হই, আমি যেন অপরিমিত দীর্ঘায়ু লাভ করি এবং কখনও যেন মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত না হই। হে পিতঃ! আমার সর্ব্বদা প্রচুর সম্পত্তি থাকিবে, যেন দুর্ভাগ্য কখনও আমার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে না পারে।

রাজা পুত্রের বাক্য শ্রবণে শোকে ম্রিয়মান হইয়া বলিলেন, বৎস! যাহা আমার ক্ষমতার অতীত তাহাই প্রার্থনা করিতেছ। ঋষিগণ কল্পে কল্পে

---

* বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও রূপ=পঞ্চস্কন্ধ। ইহারাই জড়দেহকাণ্ডস্থিত আত্মার দুঃখের হেতু।

† ললিত বিস্তর। পঞ্চদশ অধ্যায়।

জীবিত থাকিয়া জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও দুর্ভাবনার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই।

পিতার বাক্য শ্রবনে পুত্র বলিলেন, পিতঃ! যদি আপনি আমার চারিটী প্রার্থনা পূর্ণ করিতে না পারেন, তবে একটী প্রার্থনা পূর্ণ করুন। রাজা বলিলেন কি; কুমার বলিলেন,—বিদায়। রাজা ক্ষণকাল ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া বলিলেন; বৎস! জগতের মুক্তির জন্য তোমার যে অভিলাষ, তদ্দ্বারা অনেক মঙ্গল সংসাধিত হইবে সেই জন্য তোমাকে প্রোৎসাহিত করা কর্ত্তব্য, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হউক। পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া কুমার স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এদিকে রাজা নিতান্ত অস্থির হইয়া আত্মীয়গণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, কুমার নিশ্চয়ই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, আমরা কিরূপে তাঁহাকে রাখিতে পারি। রাজ-আত্মীয়গণ বলিল মহারাজ! আমরা সকলে নগরের চতুর্দ্বারে এরূপ করিয়া থাকিব যে কুমার কোন মতেই নগর হইতে বহির্গত হইতে পারিবেন না। রাজা এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে শাক্যবংশীয়গণ নগর দ্বার সমূহে সৈন্য সামন্ত সহ কুমারের দ্বারাবরোধ করিয়া রহিল। কিন্তু ললিতবিস্তরের পঞ্চদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, শাক্যসিংহের প্রস্থান কালে ললিতবাহু নামক দেবপুত্রের মায়ায় কপিলবস্তু-নগর নিবাসী স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা প্রভৃতি সকলেই নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল।

ক্রমে দ্বিপ্রহর অতীত হইল, রজনী গভীর হইয়া আসিল। শাক্যসিংহ ছন্দক নামক সারথিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, আমার অশ্ব কণ্টককে লইয়া আইস। ছন্দক এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিবিধপ্রকার বিনয় বাক্য দ্বারা শাক্যসিংহের অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিল, কিন্তু কুমার ছন্দকের সকল কথার উত্তর প্রদান করিয়া বলিলেন, ছন্দক! সর্ব্ব-প্রাণীর হিত ও মুক্তি কামনা করিয়া আমি যে কার্য্য করিব বলিয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছি, আমার সেই প্রতিজ্ঞা মহান্ মেরু পর্ব্বতের ন্যায় অটল, অচল। অনেক তর্ক বিতর্কের পর অশ্ব আনীত হইল। প্রেমময়ী পত্নীর প্রেমবন্ধন ছিন্ন করিয়া—শিশু পুত্র রাহুলকে পিতৃস্নেহ হইতে বিচ্যুত করিয়া—পিতাকে চিরবিষাদ সাগরে ভাসাইয়া—রাজসিংহাসন রাজমকুট পায়ে ঠেলিয়া—সর্ব্বার্থ-সিদ্ধ জগতে শান্তি বিতরণ ও সাম্যমন্ত্র প্রচার করিতে বহির্গত হইলেন।

কুমার অশ্বারোহণে নগর হইতে বহির্গত হইলেন। ছন্দক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি ভ্রমণের পর প্রাতঃসময় অনোমা নদীতীরে অশ্ব হইতে অবতরণ করত ছন্দককে বিদায় করিয়া, নদীতে অবগাহণ পূর্ব্বক এক দরিদ্রকে স্বীয় রাজবেশ প্রদান করিয়া তাহার ছিন্ন বস্ত্র গ্রহণ করিলেন। কুমার সর্ব্বার্থসিদ্ধ সেই ছিন্ন পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক ভিক্ষু বেশে অনিশ্চিত পথে বাহির হইলেন। দুগ্ধফেণনিভ কোমল শয্যায় পরিবর্দ্ধিত দেহ রাজসুত এত দিনে সংসার পথের কাঙ্গালী, ভিক্ষান্নপরিজীবি ফকির হইলেন। সেই বিশাল দেহপরিধি সমুন্নত অনিন্দ্যসুন্দর বরবপু ও দৈবভাবে উদ্ভাসিত অলৌকিক মুখলাবণ্য ভিন্ন তাঁহার মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। এইরূপ দীনবেশে পরিভ্রমণ করিতে করিতে শুদ্ধোদনসুত বৈশালী * নগরে উপনীত হইলেন, এবং সাধারণ সত্য জ্ঞানলাভ ভিন্ন সর্ব্ব সত্যের মূল সত্য পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে না, এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি তথায় এক ব্রাহ্মণের নিকট বিদ্যাধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তথায় মুক্তির উপযোগী কোন বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে বিফলমনোরথ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতে হইল। অতঃপর তিনি রাজগৃহে † গমন করেন। তথায় সে সময় রুদ্রক নামক এক ব্রাহ্মণ ৭০০ শ্রাবক শিষ্যের নিকট ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছিলেন। সিদ্ধার্থও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু প্রাণের যে গভীর তৃষ্ণা প্রাণাধিকা প্রিয়তমার পবিত্র প্রেমবন্ধন হইতে তাঁহাকে ছিন্ন করিয়া আনিয়াছিল, যাহার আতিশয্য প্রভাবে রাজ্যের উত্তরাধিকারী, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও রাজপুত্র একদিনের জন্যও রাজ্যসুখ অনুভব করিতে পারেন নাই, অধ্যাপকের নীরস উপদেশ ও প্রাণহীন শাস্ত্রের তত্ত্ব কথা তাঁহার হৃদয়ে সেই শান্তিজল আনয়ন করিতে পারিল না। অগত্যা তিনি সেই স্থানও পরিত্যাগ করিলেন এবং নিজের চেষ্টা উদ্যোগ ভিন্ন গুরুর উপদেশে কিছুই ফল লাভ হইবে না স্থির করিয়া অতঃপর ধ্যান বলে মুক্তির পথ আবিষ্কার করিবেন বলিয়া

* গণ্ডক বা নারায়ণী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। এক সময়ে এই স্থানে মগধের রাজসিংহাসন স্থাপিত ছিল।

† বিহার উপবিভাগের অন্তর্গত। অতি প্রাচীন কালে এই স্থানে জরাসন্ধ প্রভৃতি চন্দ্রবংশীয় রাজাগণ রাজত্ব করিতেছিলেন।

মনে মনে স্থির করিলেন। রাজগৃহে রুদ্রকের অপর পাঁচ জন শিষ্যও গুরুগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিদ্ধার্থের অনুগমন করিলেন। তদনন্তর তিনি গয়াশীর্ষ* পর্ব্বত শৃঙ্গে উপনীত হন। তথায় তিনটী চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হয়। ১মটি এই—ব্রাহ্মণই হউক আর শ্রমনই হউক, যিনি অপবিত্র কায় ও মন দ্বারা বোধ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করেন, তাঁহার সমস্ত প্রয়াসই জলমধ্যে নিমজ্জিত কাষ্ঠ খণ্ড দ্বয়ের পরস্পর সংঘর্ষণ দ্বারা অগ্ন্যোৎপাদনের ন্যায় নিষ্ফল হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ২য়—যেরূপ একখণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠ ও অপর একটি আর্দ্র কাষ্ঠের সংঘর্ষণে অগ্ন্যোৎপাদন হইতে পারে না, সেইরূপ মন অপবিত্র থাকিলে কোন ব্রাহ্মণই কেবল শুদ্ধ শরীর দ্বারা বোধজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। ৩য়—যেরূপ দুইটী শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের সংঘর্ষণে অগ্নি জ্বলিয়া উঠে সেইরূপ অকলঙ্ক দেহ মনে ধ্যানে নিযুক্ত হইলে বোধি জ্ঞান লাভ হয়। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি উর্ব্বীলব নামক গ্রামে উপস্থিত হন। এই স্থান অতি মনোরম। প্রসন্নসলিলা নিরঞ্জননদী সীমান্তদেশ প্রক্ষালন পূর্ব্বক মধুর কল কল রবে গমন করিতেছে। গ্রামের নৈসর্গিক শোভা সিদ্ধার্থের চিত্ত আকর্ষণ করিল এবং এই স্বভাবপবিত্র স্থানটীই মোক্ষলাভের নিমিত্ত প্রয়াস করিবার প্রশস্তস্থান বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়া তিনি উৎকট তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। প্রথমতঃ নাসিকারন্ধ্র ও বাঙ্‌যন্ত্র রোধ করিয়া সুকঠিন "আস্ফানক" ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন। নৈসর্গিক গমনাগমন পথ রুদ্ধ হওয়ায় নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য কর্ণরন্ধ্র দ্বারা হইতে লাগিল। পরে যখন তাহাও বদ্ধ হইল, তখন নিশ্বাস বায়ু অন্য নির্গমণ পথ না থাকায় মস্তিষ্কের শীর্ষদেশ ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে লাগিল। এইরূপ অনন্য সাধারণ উৎকট তপস্যায় মহাত্মা সর্ব্বার্থসিদ্ধ একাধিক্রমে ছয় বৎসর কাল অতিবাহিত করেন। সে তপস্যার কথা ভাবিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তিনি কোন দিন একবারে নিরাহারে অতিবাহিত করিয়াছেন। কখন বা একটি মাত্র তিল কিম্বা একটী মাত্র তণ্ডুল ভক্ষণ দ্বারা দিনপাত করিয়াছেন। সেই ভয়ানক তপস্যায় শরীর একবারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গেল। দেখিলে মনুষ্য বলিয়া চিনিতে পারা যায়

* গয় নামক অসুরের শীর্ষ এই পর্ব্বতে স্থাপিত বলিয়াই গয়াকে গয়াশীর্ষ পর্ব্বত বলে। পৌরাণিক প্রবাদ অনুসারে গয়াশিরোপরেই বিষ্ণুপদ স্থাপিত হইয়াছিল। হিন্দুসন্তানগণ সেই গয়াশিরস্থিত বিষ্ণুপদে পিণ্ড দান করিয়া থাকেন।

না। অজস্রধারে ঝড় ও বৃষ্টি তাঁহার শরীরের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, প্রখর সূর্য্যকিরণে শরীর দগ্ধ হইয়া যাইতেছে; এসকলের প্রতি ভ্রূক্ষেপও নাই; এক মনে এক প্রাণে সেই সমাধিআসনেই উপবিষ্ট আছেন। মনুষ্যের পক্ষে যাহা অসম্ভব, কবির কল্পনাতেও যাহা পঁহুছায় না, মহাপুরুষ নিজের জীবনে সেই উৎকট তপস্যা করিলেন। এক দিন নহে, দুই দিন নহে ক্রমে ৬ ছয় বৎসর কাল এইরূপ তপস্যা চলিল, কিন্তু ইহাতে কোন ফলই লাভ হইল না। তখন তিনি নিতান্তই বিফলমনোরথ হইয়া ভাবিলেন, এইরূপ শরীর নষ্ট করিলে কিছুই হইবে না। বোধিজ্ঞান লাভের জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া তিনি ধ্যান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরঞ্জনের শীতল জলে অবগাহন করিয়া মৃতপ্রায় শরীরকে কথঞ্চিৎ সুস্থ করিলেন। যে পাঁচজন শিষ্য সর্ব্বদা তাঁহার নিকট অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহারা প্রভুর এই বিসদৃশ আচরণে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিলেন। সংসারের শেষ সঙ্গী শিষ্যগণও ভণ্ডজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল; যে উৎকট তপস্যার নামেই শরীর আতঙ্কিত হয়, সেই তপস্যা দ্বারা শরীর পাত করিয়াও কোন ফল দর্শিল না; রাজকুমার নিতান্ত দুঃখিত মনে একাকী সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। অনাহারে শরীর জর্জ্জরিত হইয়াছে, একপদও অগ্রসর হইতে সামর্থ্য নাই। অবসন্নদেহে এক বৃক্ষমূলে বসিয়া পড়িলেন। তথায় দৈব-বলে আগত তত্রত্য রাজকন্যার প্রদত্ত মিষ্টান্ন ভোজন করিয়া বহুকালের ক্ষুধা নিবারণ পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ সুস্থতা লাভ করিলেন। অতঃপর সেই তন্ময় ব্যাকুল আত্মার মনোরথ সফল হইল। মহাত্মা সিদ্ধার্থ বুদ্ধিদ্রুমমূলে ধ্যানযোগে উপবেশন পূর্ব্বক সিদ্ধকাম হইয়া জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মোক্ষ লাভের অকলঙ্ক সেতু বৌদ্ধ জ্ঞান লাভ করিলেন।

এই সময়ে তাঁহার মনের আনন্দ কে বর্ণনা করিবে? লোকের দুঃখে যে হৃদয় কাঁদিয়াছিল, অসংখ্য নরনারীর দুঃখ বিমোচন জন্য যিনি স্ত্রী পুত্র পরিবার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, রাজার ছেলে হইয়া জগতবাসীর মুক্তির জন্য যৌবনের পূর্ণ বিকাশ কালে ফকির সাজিয়া আপনার শরীরকে অসাধারণ যাতনা প্রদান করিয়াছেন, আজ তিনি সেই চিরাকাঙ্ক্ষিত ফল জগতের মুক্তির সুসমাচার লাভ করিয়াছেন। ধ্যান ভঙ্গের পর তিনি আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এবং আত্মজ্ঞান পরিশূন্য হইয়া লোকের নিকট মুক্তির

সুসমাচার প্রচারের জন্য বহির্গত হইলেন। প্রথমতঃ তিনি কাশীধামে গমন করেন। তথায় পূর্ব্বের পাঁচজন শিষ্য গুরুকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিল, এবং গুরুর নিকট সেই স্বর্গীয় বাণী শ্রবণ ও তাঁহার মুখে অলৌকিক স্বর্গীয় জ্যোতি পরিদর্শন করিয়া পুনরায় তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ক্রমে তথায় অনেক ব্যক্তি তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইলেন। চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য অসংখ্য লোক সেই মহাত্মার অভ্যুদয়ের কথা শুনিয়া তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। বোধিসত্বের সংমোহন বক্তৃতাস্রোত অতি পাষণ্ডের মনকেও দ্রব করিতে লাগিল। দিন দিন অসংখ্য অসংখ্য ব্যক্তি তাঁহার শীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিতে লাগিল। পরিশেষে প্রবল প্রতাপ মগধাধিপ বিম্বসার সেই নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, এবং বুদ্ধদেবের জীবিত কালেই তাঁহার ধর্ম্ম এক প্রকার রাজ ধর্ম্মে পরিণত হইল। তাঁহার বক্তৃতার নিমিত্ত এক ধনাঢ্য বণিক শিষ্য কালান্তকবিহার নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তথায় দিন দিন অসংখ্য লোক তাঁহার উপদেশের ফাঁদে পড়িয়া তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। এই সময় তিনি স্বীয় প্রধান শিষ্য সারিপুত্র মোদ্গল্যায়ন, ও কাত্যায়ন সমভিব্যাহারে মগধেশ্বরের নিকট কিছু কাল আতিথ্য স্বীকার করেন। পরে অজাতশত্রুর হস্তে মগধাধিপতি নিধন প্রাপ্ত হইলে তিনি শ্রাবস্তি নগর চলিয়া যান। এখানেও অনাথপিণ্ডদ নামক এক বণিক কর্ত্তৃক তাঁহার জন্য এক বিহার স্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এই রূপ ক্রমে দ্বাদশ বর্ষ কাল নানা স্থানে গমন পূর্ব্বক মুক্তির সুসমাচার প্রচার করিয়া অবশেষে তিনি স্বীয় জন্মভূমি কপিলবস্তুতে গমন করেন। তথায়ও তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, পিতৃস্বসা প্রভৃতি অনেক লোক তদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই রূপ ৪০ চল্লিশ বৎসরেরও অধিক কাল তিনি লোকের নিকট বহুল-আয়াস-লভ্য সেই মহোপদেশ প্রদান পূর্ব্বক অগণ্য লোকের চিত্তকে সত্য পথে আনয়ন পূর্ব্বক অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে ন্যূনাধিক সহস্র শিষ্যমণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া কুশীনগরে ইহলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমরধামে চলিয়া যান। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও তিনি শিষ্যদিগকে ধর্ম্মের কূটীল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু কেহই তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। ফলতঃ সেই স্বর্গীয় প্রেম পবিত্রতার জাজ্বল্য-

মান অবতার স্বরূপ মহাত্মার শিষ্যদিগের মধ্যে কাহারও হৃদয়ে তদীয় প্রচারিত ধর্ম্মের কোন অংশ সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ ছিল না। অতঃপর "সমস্তই ক্ষণকাল স্থায়ী, তোমরা অসার বিষয় ভাবনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ব্বাণ লাভে প্রয়াসী হও" এই শেষ উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক মানবশ্রেষ্ঠ পরম জ্ঞানী শ্রীশ্রীমন্মহাত্মা শাক্যসিংহের অমরাত্মা জগতকে অন্ধকার করিয়া দিব্য ধামে চলিয়া গেল। ভারতের সমুজ্জল আকাশ হইতে—জগতের আকাশ হইতে—সহস্র রবিসম প্রখর সেই মহোগ্র গ্রহ চির দিনের জন্য খসিয়া পড়িল।

জগতের মুক্তির জন্য বুদ্ধদেব মানবজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারিত মহামন্ত্রই সর্ব্ব প্রথম এই ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, আর্য্য অনার্য্য সকল জাতিকে শান্তির শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিল। একদিকে যেমন তাঁহার বিশাল বক্ষে সংসার মরুতে দগ্ধদেহ বিকলাঙ্গ প্রাণিমাত্রেরই দুঃখ দূর করিবার জন্য অবিশ্রান্ত শান্তির শীতল উৎস প্রবহমান হইতেছিল, অপরদিকে, আবার যে সকল কুসংস্কার ও পাপাচার সেই মরুর দিগে নিরাশ্রয় প্রাণিদিগকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাঁহার ন্যায় তাহাদিগের ভীষণ শত্রু ও আর কেহ ছিল না। তিনিই প্রথমতঃ জাতিভেদ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেন এবং ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকে সমভাবে নিজের প্রেম আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন। তিনি লোক ও সমাজশিক্ষার জন্য আচণ্ডাল সকলের অন্নই ভোজন করিতেন। অদ্য আমরা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ জগন্নাথক্ষেত্রে দর্শন করিতে পাইতেছি।

জগতের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থাবলিতে যত কিছু মহান্ ও সুন্দর তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে, এক মাত্র ভগবান্ বুদ্ধদেবের উপদেশ সমূহ মধ্যে তৎ সমস্তই গ্রথিত রহিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণ যিশু খৃষ্টের যে দশটী উপদেশ লইয়া এত গৌরব করিয়া থাকেন, তাহা সর্ব্বপ্রথম ভগবান্ বোধিসত্বের মুখপদ্ম হইতে বিনিসৃত হইয়াছিল।

বুদ্ধদেব বলিয়াছেন ঃ—

"ক্ষমাই এজগতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম।"

"স্বভাবই মনুষ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্পত্তি।"

"ক্রোধ ও হিংসাকে পরিত্যাগ কর।"

"কাহাকেও দুর্ব্বাক্য দ্বারা বিদ্ধ করিও না।"

"অবিদ্যাই অন্ধকার স্বরূপ।"

"দীন দুঃখী ও তৃষ্ণাতুরকে অন্ন, জল ও বস্ত্র প্রদান কর।"

"নদী বক্ষে সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দেও।"

"মনুষ্য পশু ইত্যাদির জন্য পথ পার্শ্বে জলাশয় খনন কর।"

"যজ্ঞার্থে কিম্বা উদর পরিতোষ জন্য কখনও জীবহত্যা করিও না।"

"পরের দ্রব্য অপহরণ করিও না।"

"পরদার করিও না।"

"মিথ্যা কথা বলিও না।"

"মাদক দ্রব্য সেবন করিও না।" (ইত্যাদি ইত্যাদি)

এই সকল ব্যতীত ভিক্ষুদিগের প্রতি আরও ৫টী উপদেশ আছে।

"স্বর্ণ রৌপ্য গ্রহণ করা উচিত নহে।"

"অলঙ্কার ও সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করা অনুচিত।"

"দুগ্ধফেণনিভ কোমল শয্যায় শয়ন করা অনুচিত।"

"নাট্য ক্রীড়া ও সঙ্গীতাদিতে যোগ দিবে না।"

"দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে আহার করা কর্ত্তব্য নহে।"

ভগবান বুদ্ধদেবের দাহ কার্য্য সমাপ্ত হইলে তাঁহার শিষ্য ভিক্ষুগণ সেই চিতাভস্ম ধাতু নির্ম্মিত পাত্রে পূর্ণ করত কুসুমে আচ্ছাদিত করিয়া নগর মধ্যে লইয়া গেলেন। এবং সপ্তদিবস তাহা তথায় মহাসম্মানের সহিত রক্ষা করিলে, অবশেষে সেই চিতাভস্ম হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি খণ্ড সংগ্রহ করিয়া রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবস্তু অলকাপুর, রাম-গ্রাম, উথ্যদ্বীপ, পাওয়া ও কুশী নগর প্রভৃতি স্থানে স্থাপন করিয়া আটটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিলেন। উত্তর কালে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণ বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্লাবিত দেশ সমূহে ভগবান্ বোধিসত্ত্বের সম্মানও স্মরণার্থ এইরূপ অসংখ্য স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধদেবের প্রতি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের অসাধারণ ভক্তি ও প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। সেই ভক্তি ও অনুরাগ-প্রণোদিতায় তাঁহারা বুদ্ধদেবের দন্ত ও কেশাদি লইয়া তাহা সংরক্ষণ জন্য বৃহৎ বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ক্রমে এই সকল স্মরণার্থ ক্ষেত্র গুলি বৌদ্ধদিগের মহাতীর্থ শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছিল। পাঠক গণ পশ্চাৎ দেখিতে পাইবেন জগন্নাথ দেব বুদ্ধ দন্তের স্থলাভিষিক্ত এবং জগন্নাথের আকৃতি স্তূপার সম্পূর্ণ প্রতিরূপ।

বুদ্ধদেবের জীবন চরিতের অতি সামান্য অংশই অদ্য আমাদের উল্লেখ করিবার আবশ্যক ছিল। তথাপি কথা প্রসঙ্গে আমরা অনেক কথাই বলিয়াছি। যাহা হউক এস্থানে আর দুই একটী কথা উল্লেখ করিয়া পরিচ্ছেদ শেষ করিব।

বুদ্ধ দেবের মৃত্যুর পর আষাঢ় মাসে তাঁহার শিষ্য কশ্যপ পাঁচ শত জ্ঞানী ভিক্ষুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, ভগবান্ অন্তিম কালে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, যে "আমার তিরোধানান্তে আমার প্রচারিত ধর্ম্ম ও বিনয় তোমাদের পথ প্রদর্শক হইবে।" অতএব এক্ষণ আমাদের তাহার আলোচনা করা উচিত।

এই প্রস্তাবে সকলে সম্মত হইলেন। মগধেশ্বর মহারাজ অজাতশত্রু তদীয় রাজধানী রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী শত্তপাণি শিখর মূলে একটী প্রকাণ্ড বিহার নির্ম্মাণ করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন। ৬২১ পূর্ব্বশকাব্দে প্রথম সঙ্গম হইয়াছিল। ক্রমাগত ৭ মাস ধর্ম্মালোচনার পর এই সঙ্গম শেষ হয়।

বুদ্ধদেব কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। উক্ত মহাসঙ্গমে তাঁহার অমৃতোপম দেবদুর্লভ উপদেশগুলি অবলম্বন করিয়া তাঁহার শিষ্য—ব্রাহ্মণ জাতীয় কশ্যপ "অভি ধর্ম্ম", তাঁহার পিতৃব্য আনন্দ "সূত্র" এবং শূদ্র বংশজ উপালি "বিনয়" রচনা করিয়াছিলেন। ইহাই বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল গ্রন্থ। ইহা সাধারণতঃ ত্রিপিটক বলিয়া পরিচিত।

মগধেশ্বর কালাশোকের শাসনকালে (৪৮১ পূর্ব্বশকাব্দে) তাঁহার রাজধানী বৈশালী নগরে বৌদ্ধদিগের দ্বিতীয় মহাসঙ্গম হইয়াছিল।

দেবানামপিয় পিয়দশি মহারাজাধিরাজ শ্রীধর্ম্মাশোকের শাসন কালে পাটলিপুত্র নগরে বৌদ্ধদিগের তৃতীয় সঙ্গম হইয়াছিল। এই মহাসঙ্গম দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া মহারাজ অশোক পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারাভিলাষে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। (৩২৫ পূর্ব্ব শকাব্দ)*।

* এই সঙ্গমের উপদেশ অনুসারে মহারাজ অশোক ধর্ম্ম প্রচার মানসে মজঝান্তিক নামক স্থবিরকে কাশ্মীর ও গান্ধারে, মহাদেব নামক স্থবিরকে মহিষমণ্ডলে, স্থবির রক্ষিতকে বনবাসীতে, যোনধর্ম্ম রক্ষিত স্থবিরকে অপরান্তকে, স্থবির মহাধর্ম্ম রক্ষিতকে মহারাষ্ট্র দেশে, মহারক্ষিত স্থবিরকে যোনানী মণ্ডলে, মজঝিম স্থবিরকে হিমবন্ত প্রদেশে, সোন ও উত্তর

বৌদ্ধ ধর্ম্মের চতুর্থ সঙ্গম কাশ্মিরাধিপতি কনিষ্কের শাসন কালে তাঁহার রাজধানীতে হইয়াছিল। (২২১ পূর্ব্বশকাব্দ)।

বৌদ্ধধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও ধর্ম্মপ্রচারই সকল সঙ্গমের উদ্দেশ্য। ধ্যান ও জ্ঞানবলে নির্ব্বাণ লাভ করাই বৌদ্ধ জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। জন্মই সকল দুঃখের কারণ। সুতরাং যাহাতে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে না হয় প্রত্যেক মনুষ্যেরই তাহা করা কর্ত্তব্য। * এজন্য কি "রথেচ বামণং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" ঘোষিত হইয়াছে? বৌদ্ধগণ তিনটী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপাসনা করিত এবং তৎসমক্ষে ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ করিত।

নামক স্থবিরদ্বয়কে সুবর্ন ভূমিতে (ব্রহ্মদেশ) এবং মহামহেন্দ্র ও তাহার শিষ্য ইত্তেয়, উত্তেয়, সম্বল ও ভদ্রসাল নামক পঞ্চস্থবিরকে লঙ্কাদ্বীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

(মহাবংশ, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। Turner's. Mohawanso. p. 71.)

* নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ অতি উচ্চ ও মহান্। শ্রীমদ্ভগবদগীতার মূল উপদেশের সহিত ভগবান বুদ্ধদেবের উপদেশের সারাংশের যে নিতান্ত নৈকট্য সম্পর্ক আছে তাহা গীতোক্ত নির্ব্বাণ ও ধম্মপদোক্ত নির্ব্বাণ শব্দের ব্যাখ্যা আলোচনা করিলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেনঃ—

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বা স্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥

(দ্বিঃ অঃ ৭১,৭২ শ্লোক)

নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার, ও মমতাবিহীন হইয়া যে ব্যক্তি বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভোগ্য বস্তু উপভোগ করেন তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন। হে পার্থ! ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ঠা, ইহা লাভ করিলে আর সংসার মোহে মুগ্ধ হইতে হয় না, চরম সময়ে ও যিনি এই ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ঠায় অবস্থান করিতে পারেন তিনি ব্রহ্মে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিতেছেনঃ—দেহ, শির ও গ্রীবা অবক্র ও অচল ভাবে ধারণ করত স্থির হইয়া ইতস্ততঃ অনবলোকন পূর্ব্বক কেবল নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া প্রশান্ত আত্মা বিগত-ভয় ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী সংযত মন ও মৎপরায়ণ হইয়া আমাতেই চিত্ত সমাহিত করিবে।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥

(ষঃ অঃ ১৫ শ্লোক)

যোগী ব্যক্তি ঐরূপ সতত সংযত চিত্ত হইয়া আত্মাকে সমাহিত করিলে নির্ব্বাণ লাভের উপায় ভূত মৎস্বরূপ্য স্বরূপ শান্তি লাভ করেন।

বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি।

ধর্ম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি।

সঙ্গম্ শরণম্ গচ্ছামি।

বুদ্ধ।	ধর্ম্ম।	সঙ্গ।*
জগন্নাথ।	সুভদ্রা।	বলরাম।

শ্রীকৃষ্ণ আর একস্থানে বলিয়াছেনঃ—

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ॥
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥

(পঃ অঃ ২৫ শ্লোক)

যাহাদের পাপ বিনষ্ট, সংশয় ছিন্ন ও চিত্ত সংযত হইয়াছে এবং যাঁহারা সর্ব্ব প্রাণীর হিত কার্য্যে রত সেই ঋষিগণ ব্রহ্মে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকে বলিতেছেন কাম ক্রোধ বিমুক্ত, সংযত-চিত্ত আত্মতত্ত্বজ্ঞ যোগীদিগের জীবন মৃত্যু উভয় অবস্থাতেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ভগবান বুদ্ধদেব ও জীবন ও মৃত্যু উভয় অবস্থাতে নির্ব্বাণ লাভের কথা বলিয়াছেন।

ধম্মপদের ৩৭২ পদে লিখিত আছে—যিনি দেহের সৃষ্টি ও ধ্বংসের বিষয় (অর্থাৎ আত্ম-তত্ত্ব) চিন্তা করিতে পারেন, তিনি সেই চিন্তাতেই এক প্রকার আনন্দ উপভোগ করেন, জ্ঞানীগণের নিকট এই আনন্দই নির্ব্বাণ।

ধম্মপদগ্রন্থের ২১, ৮৯, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২২৩, ২৮৩, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৭০, ৩৭৪ পদ সকল পর্য্যালোচনা করিয়া ইহাই অনুমিত হয় যে, আত্মার শান্তি লাভ, সমস্ত কামনা ও স্পৃহার লয়, লাভালাভ, জয় পরাজয় ও সুখ দুঃখে সমভাব এবং জন্ম মৃত্যু চক্র হইতে পরিত্রাণই বৌদ্ধমতে নির্ব্বাণের লক্ষণ।

বেদান্ত দর্শনের মতে পরমাত্মাতে জীবাত্মার লয়ই নির্ব্বাণের শেষ ফল। কিন্তু বৌদ্ধগণ পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বারংবার জন্মমৃত্যু অর্থাৎ পরজন্ম পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করিয়া থাকেন সুতরাং যখন আত্মা জন্ম মৃত্যুর দায় হইতে মুক্তি লাভ করিবে, তখনই তাঁহাদের মতে শেষ নির্ব্বাণ হইতেছে; কিন্তু সেই অবস্থায় আত্মার কি হইবে তাহা আমরা ধম্মপদ গ্রন্থ খানা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। মেক্স-মুলার ধম্মপদ গ্রন্থের উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন যে আত্মাতে আত্মার লয় হইবে। কিন্তু বৌদ্ধ-গণ যখন পরমাত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না, তখন আত্মাতে আত্মার কিরূপে লয় হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

* সঙ্গ অর্থ সমাজ। অর্থাৎ সমাজবদ্ধ ভিক্ষুদল। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন :—

Sanga—"community" The body politic of the Buddhist priesthood

বুদ্ধ দন্ত।

দাঁতবংশের মত।*

ওঁ শ্রীমনসৌ জয়তি সত্বহিতপ্রবৃত্তসন্মানসাধিগত তত্বনয়োমুনীন্দ্রঃ।
ক্লেশার্থিনাংত্বরিতনক্রত্বরাসদান্তঃ সংসারসাগরসমুত্তরণৈকসেতুঃ॥

৬২১ পূর্ব্বশকাব্দে বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে মুনীন্দ্র শাক্যসিংহ কুশীনগরে নির্ব্বাণ লাভ করেন। সেই সময় বুদ্ধদেবের শিষ্য ক্ষেম পূর্ব্বনিয়োগ অনুসারে বুদ্ধের বাম পার্শ্বের একটী দন্ত গ্রহণ পূর্ব্বক কলিঙ্গাধিপতি ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করেন।† রাজা ব্রহ্মদত্ত একজন পরম সৌগত

---

is so called ; the word *Bauddha saugha* being exact equivalent to. "Bauddha church." It also implies a congregation of ecclesiastics, or the clerical community of any particular District or monastery. In philosophical works this word has, however, a very different signification. *According to them it is the name of the third member of the Buddhist triad and represents actual creative power, or an active creator and ruler, deriving his origin from the union of the essence of Buddha and Dharma.* (Lalita-Vestar. p. 17).

* সিংহল দ্বীপের কয়েক খণ্ড গ্রন্থে ভগবান্ শাক্যসিংহের দন্তের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রাচীন ইলু ভাষায় লিখিত "দালদবংশ" সর্ব্বপ্রাচীন ; এই গ্রন্থ ২৩২ শকাব্দে লিখিত হইয়াছিল। অধুনা দালদবংশ সুপ্রাপ্য নহে। সিংহল-রাজকুল-তিলক মহাবীর পরাক্রমবাহু শকাব্দের একাদশ শতাব্দীর অন্ত ও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অনুরাধপুরের রাজাসন উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বিধবা রাজ্ঞী লীলাবতী স্বামীর সিংহাসন অধিকার করেন। মহিষী লীলাবতী ক্রমে দুইবার রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। তাঁহার শাসন সময়ের প্রথম ভাগে (১১১৮—১১২২ শকাব্দমধ্যে) "রাজগুরু ধর্ম্মরক্ষিত" সেই দালদবংশ অবলম্বন পূর্ব্বক পালি ভাষায় "দাঁতধাতুবংশ" বা "দাঁতবংশ" গ্রন্থ রচনা করেন। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে মাস্তবর জর্জ টর্ণার সাহেব সেই দাঁতবংশ অনুবাদ করিয়া ইংরেজি ভাষায় একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। আমরা টর্ণার সাহেব লিখিত দন্ত প্রস্তাব হইতে এই তত্ত্ব উদ্ধৃত করিতেছি।

† After the funeral obsequies of Buddho had been performed at Kusinara (in the year 543 B. C.) one of his disciples Khemo there is commissioned to take his left canine Tooth to Dantapura the capital of Kalinga. The reigning sovereign there, who received the relic, was Brahmadatto.—(Turnour's Tooth relic of Ceylon. Chapter II,)

ছিলেন। তিনি যথোচিত ভক্তি ও সম্মানপূর্ব্বক সেই দন্ত স্বীয় রাজধানীতে সংস্থাপন করেন। দন্ত সংস্থাপনের স্থান দন্তপুর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রাচীন দন্তপুর বর্ত্তমান পুরী। *

ব্রহ্মদত্তের মৃত্যুর পর তাঁহার তনয় কাশী ও তদন্তে তৎপুত্র সুনন্দ উড়িষ্যা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যগুলি শাসন করিয়াছেন। ইহাঁদের দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিমল জ্যোতি উড়িষ্যায় প্রতিফলিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহাদের তীরোধানান্তে কোন্ বংশীয় কোন্ নরপতি উড়িষ্যার রাজদণ্ড ধারণ করেন তাহা দাঁতবংশে লিখিত হয় নাই।

তৎপর কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত উড়িষ্যার ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবল উন্নতির চিহ্ন উড়িষ্যা দেশের স্থানে স্থানে বিরাজিত থাকিয়া পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়িদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে। ভুবনেশ্বরের প্রায় ৪।৫ মাইল পশ্চিমে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতপুঞ্জ আছে। এই পর্ব্বতগুলি সাধারণতঃ খণ্ডগিরি নামে খ্যাত। কিন্তু শৃঙ্গ সমূহের স্বতন্ত্র নাম রহিয়াছে যথা, খণ্ডগিরি, উদয়-গিরি, নীলগিরি, ধবলগিরি ইত্যাদি। এই সকল পর্ব্বতের অঙ্গ খনন করিয়া গুহা সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে স্তম্ভবিশিষ্ট সুন্দর প্রকোষ্ঠ ও দ্বিতল ত্রিতল গৃহ ও নানা প্রকার প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই সকল প্রতিমূর্ত্তির পরিচ্ছদ দর্শন করিয়া প্রাচীন ভারতবাসীদিগের অঙ্গাচ্ছাদনের বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারা যায়। কোনও কোনও প্রতিমূর্ত্তির পদ পূর্ণ-উপানহ-মণ্ডিত। এই গৃহসমূহ মধ্যে "রাণীনহর" ই—সর্ব্বপ্রধান, গুহা গুলির মধ্যে "হাতী-গুহা," ব্যাঘ্রগুহা" ও "সর্পগুহা" প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ। এই সকল গৃহ ও গুহা গুলি যে এক সময়ে এক ব্যক্তি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল এবম্প্রকার অনুমান সঙ্গত নহে। প্রতিমূর্ত্তি গুলি বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী দ্বারা গঠিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। প্রাচীন আর্য্যজাতির শিল্প-চাতুর্য্যের নিদর্শন স্বরূপ জগদ্বিখ্যাত ইলোরার ক্ষোদিত গৃহাদির পর এই সকলের স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

উদয়গিরি-ক্ষোদিত "হাতিগুহার" দ্বারস্থ প্রস্তরে একটী বৃহৎ "প্রস্তরা-

---

* বিজ্ঞবর কনিংহাম সাহেব বর্ত্তমান রাজমহেন্দ্রীকে প্রাচীন দন্তপুর নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। (Ancient Geography of India page 518.) লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল জেইমস লো সাহেব অনুমান করেন দন্তপুর বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী। ডাক্তর রাজেন্দ্র লালমিত্রের মতে বালেশ্বর ও মেদিনীপুরের মধ্যবর্ত্তী দাঁতন নামক স্থানই প্রাচীন কালে দন্তপুর বলিয়া পরিচিত ছিল। সাহেবদিগের লেখা অপেক্ষা মিত্র মহাশয়ের উক্তিই অপেক্ষাকৃত সঙ্গত।

লেখ্য” বিরাজিত রহিয়াছে। ইহাতে ঐরনামক একজন পরাক্রমশালী বৌদ্ধরাজার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ক্ষোদিত লিপিতে মগধের নন্দরাজার উল্লেখ আছে। ইহার মর্ম্মালোচনা দ্বারা এরূপ বোধ হয় যে সুবিখ্যাত মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত যখন নন্দবংশ ধ্বংস করিতে উদ্যত হন তখন ঐররাজ তাঁহার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

এই ঘটনার কিছু কাল পরে যখন দেবানাংপ্রিয়প্রিয়দর্শী রাজা শ্রীধর্ম্মাশোক মগধরাজাসনের গৌরববর্দ্ধন করিতেছিলেন, তখন উড়িষ্যা তাঁহার দণ্ডাধীন ছিল। অপক্ষপাতিতার সহিত বিবেচনা করিলে ইহা সহজেই উপলব্ধি হইবে যে অশোকের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও পরাক্রম-শালী উদারচেতা রাজা ভারতে জন্মগ্রহণ করেন নাই। সমস্ত ভারতের সার্ব্বভৌম নরপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীধর্ম্মাশোক তাঁহার আদেশ লিপিতে ঘোষণা করিয়াছিলেন।

দেবানম্ পিয়ো পিয়দশি রাজা সবত ইচ্ছতি সবে পাষণ্ড বংসেয়ু সবে তে সয়মঞ্চ ভাবসুদ্ধিন্ চ ইচ্ছতি।

পাষণ্ড (অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থাশূন্য ব্যক্তি—) গণও সর্ব্বত্র নির্ব্বিঘ্নে বাস করুক। আহা কি উদার ভাব, পাঠক—হিন্দু, খৃষ্টান ও মুসলমান দিগের ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া বল দেখি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী কোন্ রাজা বিধর্ম্মির প্রতি এরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছেন। মহারাজ অশোক যদি বৌদ্ধ না হইতেন তাহা হইলে বোধ হয় ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া ও রামায়ণ কিম্বা মহাভারতের ন্যায় এক খানা প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করিতেন। যাহা হউক এস্থলে আর সেই সকল কথা উল্লেখের প্রয়োজন নাই। উড়িষ্যার বক্ষেও অশোকের কীর্ত্তি স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ক্ষোর্দ্দার অন্তর্গত ধউলী পর্ব্বতগাত্রে ধর্ম্মাশোকের আদেশ লিপি ক্ষোদিত থাকিয়া অদ্যাপি তাঁহার যশ ও কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এই আদেশ লিপির সার মর্ম্ম আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

১। যজ্ঞার্থে কিম্বা উদরপরিতোষ জন্য পশু ও পক্ষী বধ নিষেধ।

২। মনুষ্য ও পশুর জন্য ঔষধালয় সংস্থাপন ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিবে এবং পথপার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ ও কূপ খনন করিবে।

৩। প্রত্যেক পঞ্চম বর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের নৈতিক আদেশসমূহ প্রচার করিতে হইবে।

৪। পূর্ব্ব অবস্থার সহিত বর্ত্তমান রাজশাসনাধীন সুখের অবস্থা তুলনা করিবে।

৫। ভিন্ন ভিন্ন দেশের স্বদেশী ও বিদেশী অধিবাসীদিগকে—ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য প্রচারক নিযুক্ত করিতে হইবে।

৬। প্রজাবর্গের আচার, ব্যবহার, রীতি নীতি অনুসন্ধান জন্য ও শিক্ষার জন্য নীতিপরিদর্শক ও (ধর্ম্মের)-পথ প্রদর্শক নিযুক্ত করিতে হইবে।

৭। ধর্ম্মের একতা ও সাম্য সংস্থাপনের একান্ত ইচ্ছা।

৮। পূর্ব্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গের অনুমোদিত পাশব বা ইন্দ্রিয়-পরিতোষ-জনিত সুখের সহিত বর্ত্তমান রাজশাসনাধীন পবিত্র সুখের বিপরীত সম্বন্ধ।

৯। ধর্ম্মেতেই প্রকৃত সুখ, ধর্ম্ম আমাদিগকে পুণ্য কর্ম্মে মতি দেয়। ধর্ম্ম সদা সদনুষ্ঠান সাপেক্ষ। সদনুষ্ঠান মধ্যে, দয়া, বদান্যতা, পবিত্রতা ও সততাই প্রধান। ধর্ম্মাচরণেই প্রকৃত সুখ লাভ হয় এবং ধর্ম্মাচরণেই স্বর্গীয় সুখ ভোগ করা যায়—ইত্যাত্মক সত্য প্রচার।

১০। ইহ সংসারের সুখের অনিত্যতা এবং অসারতার সহিত ভবিষ্যৎ পুরস্কারের বিপরীত সম্বন্ধ।

১১। ধর্ম্মোপদেশদানই সর্ব্বাপেক্ষা গরিষ্ঠ দান।

১২। অবিশ্বাসীদিগকে উপদেশ দান কর্ত্তব্য।

১৩। (অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট।)

১৪। সমুদায় উপদেশ গুলির একত্র সন্নিবেশ।

রাজাগুহশিব—তৎপর কয়েক শতাব্দীর (উড়িষ্যার) ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু সেই সময়ে যে উড়িষ্যাপতিগণ মগধ সম্রাটদিগের দণ্ডাধীন ছিলেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। অশোকের একাদশ আজ্ঞা ও পশ্চাল্লিখিত বিবরণ সমূহ তাহার প্রমাণ। শকাব্দের তৃতীয় শতাব্দীতে গুহশিব নামক জনৈক রাজা উড়িষ্যা শাসন করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমরা দন্ত সন্দর্ভ হইতে তাঁহার বিবরণ উদ্ধৃত করিব।

রাজা গুহশিব বুদ্ধ-দন্তের ইতিহাস ও মহিমা অনবগত ছিলেন। হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। তিনি একদা নাগরিকগণকে উৎসবে উন্মত্ত দর্শনে তাঁহার সহচরগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "অদ্য কি জন্য উৎসব হইতেছে।" এই প্রশ্নের উত্তরে কলিঙ্গনিবাসী শ্রমণগণ তাঁহার নিকট বুদ্ধ-

দন্তের ইতিহাস ও বৌদ্ধধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন অদ্য সেই দন্তোৎসব হইতেছে। * অনেক তর্ক বিতর্কের পর গুহশিব বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বন করেন। সেই ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক প্রথমেই তিনি বৌদ্ধদ্রোহী (নিগ্রন্থী) ব্রাহ্মণ সচিববর্গকে উড়িষ্যা হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। অপমানিত ব্রাহ্মণগণ পাটলীপুত্র নগরে "জম্বুদ্বীপপতি" "রাজাধিরাজ" পাণ্ডুর নিকট উপস্থিত হইয়া গুহশিবের প্রতিকূলে অভিযোগ উপস্থিত করেন। পাণ্ডু হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, সুতরাং তিনি তাঁহার অধীনস্থ এক জন নরপতির এবম্প্রকার ব্যবহার শ্রবণে নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং চৈতন্য নামক অন্য একজন সামন্ত নরপতিকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। † গুহশিবকে তাঁহার উপাস্য দেবতার (বুদ্ধদন্ত) সহিত কারারুদ্ধ করিয়া আনিবার জন্য সম্রাট পাণ্ডু, রাজা চৈতন্যকে আদেশ করেন। চৈতন্য বৃহৎ একদল সৈন্যের সহিত কলিঙ্গরাজ্যে উপস্থিত হইয়া দন্তপুর-নগরী অবরোধ করিলেন। গুহশিব বৈরপরিহার পূর্ব্বক অতি বিনীত ভাবে সম্রাট-প্রতিনিধি চৈতন্যের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া উপঢৌকন প্রদান করেন এবং তাঁহাকে স্বীয় ভবনে লইয়া যান। চৈতন্য গুহের ভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্রাটের আদেশলিপি প্রদান করিলেন। গুহশিব অম্লানচিত্তে রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত হইলেন। ক্রমে গুহশিব চৈতন্যের নিকট তাঁহার বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার কারণ স্বরূপ বুদ্ধদন্তের ইতিহাস ও বৌদ্ধধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই সকল শ্রবণ করিয়া চৈতন্য ও তাঁহার অনুচরগণের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিল, তাঁহারা যথায় দন্ত সংস্থাপিত হইয়াছে সেই মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধদন্ত দর্শন করিলেন, এবং দন্তের মোহিনী শক্তিতে সকলকেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইল।

চৈতন্য ও গুহশিব বুদ্ধদন্ত লইয়া পাটলীপুত্র নগরে উপনীত হইলেন। রাজাধিরাজ পাণ্ডু সেই দন্ত বিনাশ করিবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ‡

---

* দন্তোৎসবই রথযাত্রা।

† "——bring hither Guhasiwo and the piece of human bone, which he worships day and night." (Turnour's Tooth relic of Ceylon. Chapter 11.)

‡ বুদ্ধ-দন্তের মহিমা প্রচার করিবার জন্য "দাঁতবংশের" তৃতীয় অধ্যায়ে বহুবিধ অলৌকিক বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার উল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

পাণ্ডু এক বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাতে সেই দন্ত স্থাপন করিলেন। তিনি স্বীয় সাম্রাজ্য দন্তের প্রতি উৎসর্গ এবং রাজা গুহশিবকে নানা প্রকার উপহার অর্পণ পূর্ব্বক সম্মানিত করিয়াছিলেন।

স্বস্তিপুরপতি রাজা ক্ষীরধার বুদ্ধ দন্ত লাভ জন্য পাণ্ডুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি সংগ্রাম-ক্ষেত্রে পাণ্ডু কর্ত্তৃক নিহত হন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর গুহশিব সেই দন্ত আনয়ন পূর্ব্বক দন্তপুরে সংস্থাপন করিলেন।

মালব দেশের জনৈক রাজপুত্র বুদ্ধদন্ত দর্শনাকাঙ্ক্ষায় দন্তপুরে উপস্থিত হন। রাজা গুহশিব সেই রাজকুমারের হস্তে স্বীয় কন্যা হেমমালাকে সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাকে দন্ত-মন্দিরের অধ্যক্ষের পদে নিয়োগ করেন। উজ্জয়িনীর রাজপুত্রের প্রকৃত নাম লিখিত হয় নাই। তিনি দন্তের অধ্যক্ষ ছিলেন, এবং উত্তর কালে সেই দন্ত তাহার দ্বারা সিংহলে নীত হইয়াছিল, এই নিমিত্ত তিনি দন্তকুমার আখ্যা প্রাপ্ত হন।

স্বস্তিপুরপতি ক্ষীরধারের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ অন্যান্য চারিজন নরপতি হইতে সাহায্য গ্রহণ পূর্ব্বক বৃহৎ এক দল সৈন্যের সহিত দন্তপুরে উপস্থিত হইলেন। এবং দূত দ্বারা গুহশিবকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, রাজা গুহশিব অবিলম্বে বুদ্ধ-দন্ত আমাদিগকে সমর্পণ করুন, না হয় সংগ্রাম ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আত্মরক্ষা করুন।

রাজা গুহশিব এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় কলত্র, দুহিতা ও জামাতাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমি প্রাণান্তে বুদ্ধ-দন্ত অন্যকে প্রদান করিব না, যুদ্ধক্ষেত্রে আমার মৃত্যু কিম্বা পরাজয় হইলে রাজ্ঞী ছদ্মবেশে মঠে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।" তৎপর জামাতাকে বলিলেন "তুমি বুদ্ধদেবের দন্ত ও তোমার স্ত্রীকে লইয়া সিংহলদ্বীপে গমন করিবে।" দন্তকুমার বলিলেন "সিংহলদ্বীপে আমরা কোন্ মহাত্মার আশ্রয় গ্রহণ করিব?" রাজা উত্তর করিলেন "সিংহলরাজ মহাসেন একজন পরম সৌগত, তিনি বারম্বার দন্তের জন্য উপহার প্রেরণ করিয়াছেন এবং দন্তস্নানোদক আমার নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া লইয়া গিয়াছেন।" এই সকল উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক গুহশিব রণক্ষেত্রে গমন করেন, তথায় ক্ষীরধারের ভ্রাতুষ্পুত্রের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

দন্তকুমার শ্বশুরের মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র দন্ত গ্রহণ পূর্ব্বক গোপনে রাজনিকেতন হইতে বহির্গত হইলেন এবং কিয়দ্দূর গমন করত এক

বৃহৎ নদী অতিক্রম পূর্ব্বক নদীতীরবর্ত্তী বালুকাচরে সেই দন্ত প্রোথিত করিলেন। রাজকুমার পুনর্ব্বার রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া ছদ্মবেশে দন্তপুর পরিত্যাগ করেন। তৎপর বালুকাচর হইতে বুদ্ধদন্ত উদ্ধার পূর্ব্বক দন্তকুমার ও তাঁহার পত্নী কিছু কাল অরণ্যে লুকায়িত ছিলেন। তথা হইতে তাঁহারা গোপনে তাম্রলিপ্ত নগরে উপনীত হন। তাম্রলিপ্ত নগরে অর্ণবপোতারোহণ করিয়া তাঁহারা সিংহলে গমন করেন।

তাঁহারা সিংহলে পদার্পণ করিয়া জ্ঞাত হইলেন যে, রাজা মহাসেন কাল কবলিত হইয়াছেন; শ্রীমেঘবাহন অনুরাধপুরের রাজাসনে বিরাজ করিতেছেন। তিনিও সৌগত; সুতরাং দন্তকুমার ও হেমমালা সিংহলে সাদরে গৃহীত হইলেন। রাজা শ্রীমেঘবাহন দন্তকুমার হইতে দন্ত গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা দেবানমপিয়—তিষ্য নির্ম্মিত মন্দিরে সংস্থাপন করেন।*

শ্রীমেঘবাহন ২২৪ শকাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার অভিষেকের নবম বর্ষে অর্থাৎ ২৩২ শকাব্দে দন্তকুমার ও হেমমালা সিংহলে পদার্পণ করেন। সুতরাং ২৩১ শকাব্দে কিম্বা তাহার পূর্ব্ব বৎসর ক্ষীরধারের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ ভীমবেশে দন্তপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রক্তবাহুর উড়িষ্যা আক্রমণ "প্রচলিত প্রবাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বিজ্ঞবর ষ্টারলিং সাহেব বলিয়াছেন "এই প্রবাদের মূলে অবশ্যই কোনও সত্য লুক্কায়িত রহিয়াছে, কিন্তু আমি সেই সত্য আবিষ্কার করিতে সম্পূর্ণ অপারগ হইয়াছি।" † আমাদের বিবেচনায় ক্ষীরধারের ভ্রাতুষ্পুত্রকেই উড়িষ্যা

---

* দীর্ঘকাল এই দন্ত সিংহলে ছিল। ভুবনেকবাহুর শাসনকালে (১২২৫—৩৬ শকাব্দ) পাণ্ড্যপতিকুলশেখরের সেনাপতি অরি চক্রবর্ত্তী সিংহল বিজয় করিয়া বুদ্ধ-দন্ত পাণ্ড্য নগরে লইয়া যান। ভুবনেকবাহুর উত্তরাধিকারী রাজা (তৃতীয়) পরাক্রমবাহু পাণ্ড্য নগর জয় করিয়া সেই দন্ত পুনর্ব্বার সিংহলে আনয়ন করেন। ঐতিহাসিক রেবিরো (Rebeiro) বলেন "১৪৮২ শকাব্দে পর্টুগিজ যুদ্ধ কালে কনেষ্টেনটাইন ডি ব্রাগাঞ্জা বুদ্ধ-দন্ত বিনষ্ট করিয়াছেন।" অধুনা সিংহলে যে দন্ত রক্ষিত হইয়াছে, তাহা নক্রদন্ত অনুমিত হইয়াছে। কিন্তু সিংহলবাসী বৌদ্ধগণ বলেন বুদ্ধ-দন্ত নষ্ট হইবার নহে এবং পর্টুগিজ যুদ্ধ কালে তাহা সাফ্রাগমের দেলগামৌ মন্দিরে লুক্কায়িত ছিল। (The native authorities, however represented that the Relic was safely concealed at *Delgamoa* in *Saffragam* during those wars. Turnour's Tooth Relic of Ceylon).

† A. R. Vol. XV. p. 263.

বাসীগণ "রক্তবাহু" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ২৩১ কিম্বা ২৩২ শকাব্দে ক্ষীরধারের ভ্রাতুষ্পুত্র উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। মাদলাপাঞ্জিতে লিখিত আছে ২৪০ শকাব্দে শোভনদেব সিংহাসনাধিরূঢ় হন। তাঁহার শাসনকালে রক্তবাহু উড়িষ্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সিংহল দেশীয় ইতিহাসের লিখিত সময়ের সহিত মাদলাপাঞ্জির লিখিত সময়ের ৯।১০ বৎসর মাত্র অন্তর হইতেছে। বিবেচনা করিতে গেলে এই সামান্য প্রভেদ উল্লেখ যোগ্য নহে। *

মাদলাপাঞ্জিতে লিখিত আছে রক্তবাহু অর্ণবপোতারোহণে উড়িষ্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। দাঁতবংশে ক্ষীরধার ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে স্বত্তিপুর (Swattipura) পতি বলা হইয়াছে। মহাবংশের মতে অযোধ্যার রাজধানী শ্রাবস্তির পালি নাম স্বত্তিপুর। কিন্তু শ্রাবস্তি পতির অর্ণবপোতারোহণে উড়িষ্যায় উপস্থিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; সুতরাং এস্থলে আমাদের বিবেচনায় "স্বত্তিপুর" ত্রিপুরা শব্দের অপভ্রংশ। শ্যামদেশীয় বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থে ক্ষীরধারকে "চট্টবাড়ী" নামক স্থানের রাজা বলা হইয়াছে। † বোধ হয় পাঠকগণ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন "চট্টবাড়ী" বা "চট্ট গৃহ" "চট্টগ্রাম" শব্দের রূপান্তর মাত্র। চট্টগ্রাম যে প্রাচীনকালে ত্রিপুরেশ্বরদিগের করতলস্থ ছিল, তাহা আমরা বিশেষ রূপে চট্টগ্রামের পুরাতত্ত্বে প্রমাণ করিয়াছি। অতএব আমাদের বোধ হইতেছে

---

* কিঞ্চিদধিক তিন শতাব্দী পূর্ব্বে সোলিমান সাহের বিখ্যাত সেনাপতি রাজু (রাজচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, বা রাজনারায়ণ, প্রকাশ্য নাম কালাপাহাড়) উড়িষ্যা জয় করিয়াছিলেন। যে ঘটনা অদ্যাপি উড়িষ্যার আবালবৃদ্ধের হৃদয়ে রক্তাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, মাদলাপাঞ্জির মতে ১৪৮০ শকাব্দে (১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে) সেই ঘটনা হইয়াছিল। কিন্তু মুসলমান ইতিহাস লেখকদিগের মতে ১৪৯০ শকাব্দে (১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে) রাজু কর্ত্তৃক উড়িষ্যা বিজিত হয়। (Stewart's Bengal page 95 and Blockmann, J. A. S. B. Vol. XLIV., p. 303). তিন শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার যখন এই দশ বৎসরের প্রভেদ দৃষ্ট হইতেছে, তখন ১৫।১৬ শত বৎসর পূর্ব্বের ঘটনায় ৮।৯ বৎসরের প্রভেদ উল্লেখযোগ্যই নহে।

† Gleanings in Buddhism, or translation of Passages from a Siamese version of Pali work, termed in Siamese "Phara Pathom" with passing observation on Buddhism and Brahmannism. By Lt. Col. James Low, M. A. S. B. and C. M, R. A, S,

ত্রিপুরেশ্বর চট্টগ্রামে অর্ণবপোতারোহণ পূর্ব্বক সাগর অতিক্রম করিয়া উড়িষ্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দিগম্বর-সৈন্য (কুকি) গণকে দর্শন করিয়া উড়িষ্যাবাসীগণ ত্রিপুরেশ্বরকে "যবন" নির্ণয় করিয়াছিল।

রক্তবাহুর আক্রমণ কালে জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি ভূগর্ভে প্রোথিত রাখিবার কথা মাদলাপাঞ্জিতে লিখিত হইয়াছে। দাঁতবংশের মতে সেই সময়ে বুদ্ধ-দন্তও বালুকাচরে প্রোথিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। মাঁদলা-পাঞ্জির মতে রাজা জগন্নাথকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। দাঁতবংশও প্রায় তাহাই বলিতেছে।

বংশাবলীর ও অন্যান্য উড়িয়া গ্রন্থের মতে ইন্দ্রদ্যুম্ন মালব দেশের রাজা বা রাজপুত্র। দন্তকুমারও তাহাই বটেন। উড়িয়া ব্রাহ্মণগণ কৌশল-ক্রমে ইন্দ্রদ্যুম্নের বংশলোপ করিয়াছেন। দন্তকুমার ও হেমমালা চির-কালের তরে স্বদেশের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক সিংহলে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব আমাদের নিশ্চয় বোধ হইতেছে জগন্নাথ-দেব বুদ্ধ দন্তের স্থলাভিষিক্ত। *

* উড়িষ্যার ইতিহাসলেখক—উড়িষ্যা নিবাসী ৺ বাবু প্যারীমোহন আচার্য্য লিখিয়া-ছেন যে—"বৌদ্ধঙ্ক মালমসল্লারু যে জগন্নাথ দেবঙ্কর সৃষ্টি হইঅছি এথিরে কোনসি সন্দেহ নাহি।" অর্থাৎ বৌদ্ধদিগের মাল মসল্লা দ্বারা যে জগন্নাথ দেবের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৺ প্যারীমোহন আচার্য্যের উড়িষ্যার ইতিহাস, ৪৭ পৃষ্ঠা।

যযাতি কেশরী ও জগন্নাথদেব।

ঐতিহাসিক মত।

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং।
কেশবধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশহরে॥
গীতগোবিন্দ; প্রথম সর্গ।

কেশরী বংশ—এই রাজবংশীয় কতিপয় নৃপতির নামের অন্তে কেশরী শব্দ সংযুক্ত থাকায় ইহাঁরা "কেশরীবংশ" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেশরী বংশীয় সমুদয় ভূপতির নামেই কেশরী শব্দ সংযুক্ত ছিল না, প্রাচীন লেখকগণ ভ্রমক্রমে সকলকেই "কেশরী" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। শাসন পত্রে জনমেজয় কিম্বা তদীয় পুত্র যযাতির নামের অন্তে কেশরী শব্দ দৃষ্ট হয় না। নামের অন্তভাগ লইয়া যে সকল রাজবংশের নামকরণ হইয়াছে তৎ সমস্তেই এবম্প্রকার সামান্ত ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। সুবিখ্যাত গুপ্ত রাজবংশের দ্বিতীয় নরপতি মহারাজ ঘটোৎকচের নামে "গুপ্ত" শব্দ সংযুক্ত নাই। বঙ্গীয় সেন রাজশ্রেণীর কোন কোন নরপতির নামের অন্তে "সেন" শব্দ দৃষ্ট হয় না।

জনমেজয় দেব।—মাদলাপাঞ্জির মতে যযাতি কেশরীবংশের স্থাপয়িতা। বংশাবলীলেখক যযাতির পিতা চন্দ্রকেশরীকে এই বংশের স্থাপনকর্ত্তা লিখিয়াছেন। যযাতির জন্মদাতার নাম সম্বন্ধে বংশাবলীলেখকের কিঞ্চিৎ ভ্রম হইয়া থাকিলেও আমরা তাঁহার বাক্য প্রকারান্তরে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। বোধ হয় চন্দ্র বংশীয় আদি কেশরী এই প্রবাদ অবলম্বন করিয়া বংশাবলীলেখক জনমেজয়কে চন্দ্রকেশরী লিখিয়াছেন।

যযাতির তাম্রশাসন পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তাঁহার পিতা জনমেজয় ভুজবলে "যবনদিগকে" জয় করিয়া মহানদীতীরস্থিত চৌদুয়ার নগরে রাজপাট সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রবল পরাক্রমের সহিত উড়িষ্যা শাসন করিয়াছিলেন। সম্বলপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন পাঠে অনুমিত হয় রাজা জনমেজয় মগধ রাজদণ্ডের অধীন ছিলেন। দন্তকুমার ও হেমমালা বুদ্ধদন্ত লইয়া উড়িষ্যা হইতে

পলায়ন করিলে রক্তবাহু ও তাঁহার সহচরগণ কিছুকাল উড়িষ্যা শাসন করিয়াছিলেন, তদন্তে মহারাজাধিরাজ মহাভব গুপ্ত রক্তবাহুর সহচরবর্গকে উড়িষ্যা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া জনমেজয়কে উৎকল সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ জনমেজয় মগধাধিপতির জনৈক সেনাপতি ছিলেন (রাজবংশজ হওয়াই সম্ভব) এবং তাঁহার বাহুবলেই উড়িষ্যা রক্তবাহুর অনুচরবর্গের কবলভ্রষ্ট হইয়াছিল।

জনমেজয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন নাই। চৌদুয়ার ও পুরণের তাম্রশাসনের মর্ম্মালোচনায় অনুমিত হয় যে, জনমেজয়ের তিরোভাব ও যযাতির আবির্ভাব কাল মধ্যে আরও দুই তিন জন নরপতি উড়িষ্যা শাসন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলই গুপ্ত নরেন্দ্রদিগের নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা ছিলেন। জনমেজয়, কন্দর্প ও যযাতির তাম্রশাসন পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা তৎকালীন গুপ্ত রাজ বংশের নিম্নলিখিত বংশাবলী সঙ্কলন করিয়াছি।

১। শ্রীশিবগুপ্ত দেব।

২। শ্রীমহাভবগুপ্ত। ৩। শ্রীমহাদেবগুপ্ত।

৪। শ্রীমহাশিবগুপ্ত।

১ ও ২ নং নাম জনমেজয়ের শাসনপত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১ ও ৩ নং নাম কন্দর্প দেবের শাসন পত্রে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ২ ও ৪ নং নাম যযাতির তাম্রশাসনে দৃষ্ট হইয়া থাকে। চৌদুয়ার নগরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন পাঠে অনুমিত হয় মহাদেব গুপ্তের শাসনকালে কন্দর্পদেব উড়িষ্যা শাসন করিতেছিলেন।

কন্দর্পদেবের শাসনপত্র পাঠে বোধ হয় এই সনন্দ জনমেজয়ের সনন্দ দর্শন করিয়া লিখিত হইয়াছিল। মহাভব গুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা মহাদেব গুপ্ত জনমেজয়ের পুত্রকে রাজ্য প্রদান না করিয়া কন্দর্পদেবকে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কন্দর্পদেবের পর আরও ২।১ জন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু মহাভবগুপ্তের পুত্র মহাশিবগুপ্ত রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া যযাতিকে উড়িষ্যার সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন—এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

যযাতি কেশরী—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যযাতি জনমেজয়ের পুত্র। তিনি মহারাজাধিরাজ মহাশিবগুপ্তের সমসাময়িক ও দণ্ডাধীন ছিলেন।

মহারাজা যযাতি স্বনামখ্যাত "যযাতিপুর" মতান্তরে "যজ্ঞপুর" (যাযপুর) নগরী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় রাজপাট স্থাপন করেন। প্রবাদ অনুসারে মহারাজ যযাতি আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দশ সহস্র ব্রাহ্মণ আনয়ন পূর্ব্বক যযাতিপুরের চতুস্পার্শ্বে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই প্রবাদ কত দূর সত্য তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু বিখ্যাত লেখক হণ্টার সাহেব ভ্রমক্রমে ইহাই উড়িষ্যায় ব্রাহ্মণ আগমনের প্রথম সূত্র লিখিয়াছেন। যযাতির বহুকাল পূর্ব্বেই যে ব্রাহ্মণগণ উড়িষ্যায় উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা দেখাইতে হইবে না। কেশরী বংশের শাসনারম্ভে যদি কোন ব্রাহ্মণ আর্য্যাবর্ত্ত হইতে উড়িষ্যায় উপনীত হইয়া থাকে, তবে তাহা জনমেজয়ের শাসন কালে হওয়াই সম্ভব। শৈব নরপতি মহাভবগুপ্ত বৌদ্ধদিগের হস্ত হইতে উড়িষ্যার উদ্ধার সাধন পূর্ব্বক যৎকালে জনমেজয়কে উৎকল রাজাসনে স্থাপন করেন; সেই সময় অবশ্যই ধর্ম্ম ও রাজকার্য্যানুরোধে এক দল ব্রাহ্মণ মগধ হইতে উড়িষ্যায় প্রেরিত হইয়াছিল। যযাতি কতকগুলি যাগ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই কার্য্য সম্পাদন জন্য আর্য্যাবর্ত্ত হইতে এক দল বৈদিক ব্রাহ্মণ আনীত হওয়া সম্ভব। অদ্যাপি সেই সকল বৈদিক ব্রাহ্মণসন্তান যাযপুরে বাস করিতেছেন, তাঁহারা অগ্নিহোত্রী নামে পরিচিত। বৈদিক নিয়ম অনুসারে অদ্যাপি তাঁহাদের গৃহে অগ্নিদেব সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছেন। আমাদের প্রাচীন ভ্রাতা পার্সিগণও এই বৈদিক নিয়মটী রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

ঐতিহাসিক তত্ত্বালোচনায় কেশরী বংশের রাজ্যারম্ভে আমরা উড়িষ্যায় একটী প্রকাণ্ড বিপ্লব দেখিতে পাইতেছি। প্রাচীন কালে আদিম, বৌদ্ধ ও হিন্দু এই তিন সম্প্রদায়ের লোক উড়িষ্যায় বাস করিত। রক্তবাহুর অনুচরগণ দ্বারা আরও একটী শ্রেণী বৃদ্ধি হয়। তৎপরে শৈব নরপতিগণ উড়িষ্যা বিজয় করিয়া আরও এক দল নূতন হিন্দু উৎকলে স্থাপন করিলেন। এই সকল লোক একত্রিত হইয়া উড়িষ্যায় যে বিপ্লব উপস্থিত করে—হস্ত পদবিহীন, কিম্ভূত কিমাকার, জগন্নাথমূর্ত্তিই তাহার প্রত্যক্ষ ফল। যাহাহউক এক্ষণে আমরা যযাতি কেশরী দ্বারা জগন্নাথ স্থাপন সম্বন্ধে যে বিবরণ উড়িষ্যার ইতিহাসে প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা এস্থলে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

উড়িষ্যার জাতীয় ইতিহাস মাদলাপাঞ্জি বলে—কতকগুলি দৈব চিহ্ন ও অলৌকিক ঘটনা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া মহারাজ যযাতিকেশরী জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি ও মন্দির অনুসন্ধান জন্য পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করেন। তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে বলিলেন, এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, প্রায় সার্দ্ধেক শতাব্দী পূর্ব্বে—রক্তবাহুর আক্রমণকালে—শ্রীজীউ মূর্ত্তি সোনপুর গোপালী নামক স্থানে লুক্কায়িত রাখা হইয়াছিল। অদ্যাপি সেই মূর্ত্তি ঐ স্থানে লোক চক্ষুর অন্তরালে বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজা এই সংবাদ শ্রবণান্তর সোনপুরের অরণ্য মধ্যে গমন করিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর অলৌকিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া যযাতিকেশরী সেই স্থানটী প্রাপ্ত হইলেন। শাখা প্রশাখা বিস্তৃত প্রকাণ্ড অশ্বত্থ দ্রুম দ্বারা সেই পবিত্র স্থান আচ্ছাদিত রহিয়াছে। তিনি সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষটীকে সমূলে উৎপাটন করিয়া একটী প্রস্তরাধার হইতে বিকৃত ও জীর্ণ শ্রীমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেন। তৎপর শ্রীমূর্ত্তির পূজক ও সেবক দইতাপতি বংশধরদিগের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া রাজা রত্নপুর প্রদেশে তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তৎপর দইতাপতিদিগের পরামর্শানুসারে রাজা অরণ্য হইতে দারু আনাইয়া জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক এক মন্দির প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঐ সকল দেব মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। এবং সেবা পূজার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য পুরীর চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি দেবোত্তর স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। পুনর্ব্বার জগন্নাথ প্রতিষ্ঠা দ্বারা রাজা যযাতি কেশরী "দ্বিতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অধুনা যে সকল দেব মূর্ত্তির পূজার্চ্চনা হইতেছে, যদিচ সময় সময় তাহাদের 'নবযৌবন' অর্থাৎ সংস্কার কার্য্য হইয়া আসিতেছে, তথাপি যযাতি কেশরী প্রকৃত পক্ষে ইহার স্থাপনকর্ত্তা। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রীতিবর্দ্ধন জন্য রাজা বৌদ্ধদিগের স্তূপের আদর্শানুসারে এই সকল দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী শবরদিগকেই দেবতার প্রধান পূজক ও পাচকের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এ দিকে আবার হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রীত্যর্থে, ব্রাহ্মণদিগকেও সেই দেবমূর্ত্তির সেবা পূজা সম্বন্ধীয় কোন কোন কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল। বৌদ্ধদিগকে যখন সমূলে উৎপাটন করা ব্রাহ্মণদিগের অসাধ্য হইয়াছিল, তখনই তাঁহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎকৃষ্ট

অংশ সকল গ্রহণ পূর্ব্বক বুদ্ধদেবকে ভগবান নারায়ণের নবমাবতার বলিয়া ঘোষণা করিতেছিলেন।

৩৯৬ শকাব্দে মহারাজ যযাতি কেশরী উৎকলের রাজদণ্ড ধারণ করেন। ইহার ত্রয়োদশ বৎসরান্তে অর্থাৎ ৪০৯ শকাব্দে তাঁহার দ্বারা জগন্নাথ দেব স্থাপিত হইয়াছিল। যে সকল পুরাণ ও উপপুরাণে জগন্নাথ দেব ও পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের বর্ণনা আছে তৎসমস্তই ইহার পরবর্ত্তী। সুতরাং বোধ হয় অসাধারণ রাজনীতি বিশারদ মহারাজা যযাতি কেশরী নবাধিকৃত প্রদেশে শান্তি স্থাপন জন্য ভগবান বুদ্ধ দেবকে নারায়ণের নবম অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের আকৃতির সহিত কোন হিন্দু দেবমূর্ত্তির বিন্দু মাত্রও সাদৃশ্য নাই, পক্ষান্তরে বৌদ্ধদিগের স্তূপের সহিত ইহার বিশেষরূপ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইতেছে।

বৌদ্ধগণ পঞ্চভূতের এক একটী আকার প্রদান করিয়াছেন। ক্ষিতি (আ) সম কোন যুক্ত চতুর্ভুজ, অপ্ (ভা) বৃত্ত, তেজঃ (রা) ত্রিভুজ, মরুৎ (কা) অর্দ্ধচন্দ্র, ব্যোম (খা) সূক্ষ্ম কোণযুক্ত ক্ষুদ্র বৃত্ত। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির প্রস্তর পর্য্যায়ক্রমে উপর্য্যুপরি স্থাপন করিয়া বৌদ্ধগণ

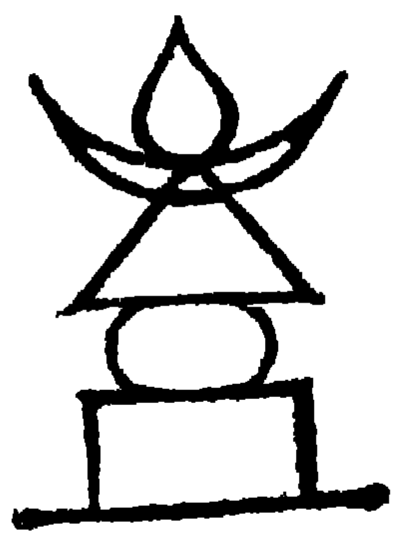

মানব পরিমাণ—৩॥০ হস্ত উচ্চ স্তূপ নির্ম্মাণ করিতেন; পার্শ্বে তাহার প্রতিকৃতি দেওয়া গেল। এই স্তূপের আকৃতি অনুসারেই জগন্নাথ সুভদ্রা ও বলরামের আকৃতি গঠন করা হইয়াছিল। জেনারেল কনিংহাম সাহেব "ভিলসা স্তূপ" নামক গ্রন্থের ৩২ সংখ্যক চিত্রপটে বৌদ্ধযন্ত্রের যে প্রতিলিপ প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে ইহা নিতান্ত বালক বুদ্ধিতেও অনুমিত হইবে যে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি সেই যন্ত্রের সম্পূর্ণ অনুকরণ। স্বর্গীয় মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত কনিংহামের গ্রন্থ হইতে এই চিত্রপটটী তাঁহার "উপাসক-সম্প্রদায়ের" দ্বিতীয় ভাগের ৩৩২ পৃষ্ঠায় পুনর্ম্মুদ্রিত করিয়াছেন। পাঠকগণ একবার তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

বৌদ্ধগণ বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্গ এই তিনটী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া কুসুমরাশি দ্বারা তাহা সজ্জিত করত তাঁহার উপাসনা ও বন্দনা করিত। এজন্য পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ত্রিমূর্ত্তি গঠিত হইয়াছিল। এস্থলে ধর্ম্মকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। স্ত্রী পুরুষের একত্র সমাবেশ রূপ কল্পনা করিয়া এই যুগল

রূপের পূজা করাই এদেশের চিরন্তন পদ্ধতি। হিন্দুগণ সর্ব্বত্রই হরের সহিত পার্ব্বতী, বিষ্ণুর সহিত লক্ষ্মী মূর্ত্তি সংযোজিত করিয়া প্রকৃতি পুরুষের একত্র পূজা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কুত্রাপি এরূপ ভ্রাতা ভগিনীর একত্র পূজা প্রচলিত থাকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

যযাতি কেশরীর রাজ্যাধিকারের প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে চীন দেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফাহিয়ান ভারত ভ্রমণাভিলাষে আগমন করেন। তিনি 'যুথিয়ান' আধুনিক খোটান প্রদেশে উপস্থিত হইয়া বৌদ্ধদিগের যে রথযাত্রা দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই রথ যাত্রার সহিত জগন্নাথের রথ যাত্রার কিছু মাত্র প্রভেদ নাই, এজন্য আমরা ফাহিয়ানের বর্ণনার ঐ অংশের অনুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

ফাহিয়ান্ বলিতেছেনঃ—আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষে রাজ্যের সমস্ত পথ-ঘাট জলসিক্ত ও নগরের প্রবেশ দ্বার নানা বর্ণের পতাকা ও পুষ্প দ্বারা বিভূষিত হয়, রাজা, রাজ্ঞী ও রাজ্যের সুন্দরী রমণীগণ অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া সঙ্ঘালয়ের শ্রমণ দিগের সহিত ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেন, এবং তাঁহাদিগের সহিত দেব মূর্ত্তির অগ্রে পদব্রজে গমন করেন। সেই স্থান হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে বিংশতি হস্ত উচ্চ এক রথ প্রস্তুত থাকে। রথের আকার গৃহের ন্যায়, সপ্তরত্ন, কুসুম ও রেশমী পরদা দ্বারা বিভূষিত। রথোপরে মধ্যস্থানে দেব মূর্ত্তি, দুই পার্শ্বে দুই বোধিসত্ত্ব আসীন আছেন। তদ্ব্যতীত চতুর্দ্দিকে স্বর্ণ রৌপ্য ও নানাবিধ বহুমূল্য প্রস্তর নির্ম্মিত দেব দেবীর মূর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়। সেই প্রবেশ দ্বার হইতে এক শত পদ নগর মধ্যে অগ্রসর হইয়া নরপতি রাজ মুকুট ও পাদুকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন বস্ত্র পরিধান করেন। অবশেষে দেবমূর্ত্তিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পুষ্প ও ধূপ ধুনা দিয়া পূজা করেন। রথ রাজবাটীর নিকটবর্ত্তী হইলে সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ রাজ প্রাসাদ হইতে পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা রথ ছাইয়া ফেলে। রাজ্যের চতুর্দ্দশ সঙ্ঘালয়ে বিশেষ বিশেষ দিনে এইরূপ রথ যাত্রার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।*

আমরা ইতিপূর্ব্বে যে দন্তোৎসবের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও রথ যাত্রাই বটে। এই সকল অনুকরণ করিয়াই জগন্নাথের রথযাত্রা প্রচলিত হইয়াছে।

* Pilgrimage of Fa Hian. page 18.

সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া হিন্দুদিগের যে অসংখ্য দেব মন্দির সেই প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তৎসমস্তেরই প্রবেশ দ্বার দক্ষিণ কি পশ্চিম দিকে প্রস্তুত হইয়াছিল। অদ্যাপি হিন্দুগণ এই নিয়মানুসারেই দেবমন্দিরের দ্বার নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। কিন্তু বৌদ্ধেরা তাহা করিতেন না, তাঁহাদিগের দেবমন্দিরের প্রধান দ্বার মন্দিরের পূর্ব্বদিকে প্রস্তুত হইত। বিহার প্রদেশে যে সকল অর্দ্ধভগ্ন বৌদ্ধ মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমস্তেরই প্রবেশ দ্বার পূর্ব্বদিকে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অদ্যাপি এই প্রণালী অনুসারে তিব্বত দেশীয় বৌদ্ধগণ মন্দিরের প্রধান দ্বার নির্ম্মাণ করিয়া আসিতেছেন। পাঠক, একবার উড়িষ্যায় যাইয়া জগন্নাথের মন্দির দর্শন কর; দেখিবে ইহারও প্রধান দ্বার বৌদ্ধদিগের প্রথা অনুসারে পূর্ব্ব দিকেই প্রস্তুত হইয়াছে। পূর্ব্বদ্বার বিশিষ্ট মন্দির কখনই বৌদ্ধ ব্যতীত হিন্দুর হইতে পারে না।

তৎপর সেই চণ্ডাল জাতীয় পাচক ও পূজক প্রভৃতি সকলই জগন্নাথের মন্দিরে আপনাদের পূর্ব্ব প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইল। বুদ্ধদেবের উদার নীতি অনুসারে ছত্রিশজাতি একত্র হইয়া তাঁহার প্রসাদ ভোজন করিতে লাগিল। উচ্ছিষ্ট ভেদ, জাতিভেদ বিছুমাত্র রহিল না, দেখিয়া বৌদ্ধগণ সন্তুষ্ট চিত্তে হিন্দু রাজার রাজদণ্ড মস্তকে গ্রহণ করিল।

অসাধারন ওজস্বী কুটীলনীতিপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ সেই বৌদ্ধ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধদেবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেনঃ—

> নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
> সদয়হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং।
> কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥

ধন্য যযাতি কেশরি! তোমার যত্নে সর্ব্বপ্রথম দুইটী পরস্পর বিদ্বেষী সম্প্রদায়ের সম্মিলন হইয়াছিল। তোমার যত্নে সর্ব্বপ্রথম হিন্দুগণ আপনাদের পরম শত্রু বুদ্ধদেবকে নারায়ণ বলিয়া পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তোমার যত্নে হিন্দুগণ জাতিভেদ ভুলিয়া ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত একত্র উপবেশন পূর্ব্বক বুদ্ধদেবের প্রসাদ ভোজন করিতে লাগিল। কুশাগ্রবৎ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ সূচের ন্যায় বৌদ্ধদিগের মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিলেন। উত্তর কালে সেই সূচি কুঠারের ন্যায় বৌদ্ধদিগের

বিনাশ সাধন করিয়া বহির্গত হইবে, তাহা বৌদ্ধগণ স্বপ্নেও জানিতে পারিলেন না।

মহারাজ যযাতি কেশরী জগন্নাথ প্রতিষ্ঠা করিয়াই ধর্ম্ম কার্য্য হইতে বিরত হন নাই। তিনি লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বরের জগদ্বিখ্যাত মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রায় এক শতাব্দী অন্তে রাজা ললাটেন্দু কেশরীর সময়ে এই মন্দির সম্পূর্ণ হয়। আমরা বারাণসী প্রভৃতি অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া অনেক শিব লিঙ্গ দর্শন করিয়াছি। কিন্তু ভুবনেশ্বরের ন্যায় এরূপ শিব লিঙ্গ আর কোথাও দর্শন করি নাই। লিঙ্গ সমূহের মধ্যে যেরূপ ভুবনেশ্বর শ্রেষ্ঠ সেই রূপ ভারতবর্ষীয় মন্দির সমূহের মধ্যে ভুবনেশ্বরের মন্দির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

জগন্নাথের বর্ত্তমান মন্দির।

রাজা অনিয়ঙ্ক ভীমদেব।

কেশরী বংশের অধঃপতনের পর গঙ্গারাঢ়ী অর্থাৎ তামলুকের রাজাগণ উড়িষ্যা অধিকার করেন। ইহাদিগের মধ্যে অনন্তবর্ম্মা সমধিক পরাক্রমশালী ছিলেন। কোন কোন ইতিহাস-লেখক ইহাকে কোলাহল নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই অনন্ত-বর্ম্মা বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যবাসিনী দেবী স্থাপন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি এই দেবী মূর্ত্তির সেবা পূজার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য মহানদী তীরস্থিত দান্দি গ্রাম উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

এই গঙ্গারাঢ়ী বংশে উত্তর কালে অহিরাম নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র স্বপ্নেশ্বর ও কন্যা সুরমা দেবী। পিতার মৃত্যুর পর স্বপ্নেশ্বর উৎকলের রাজদণ্ড ধারণ করেন। তিনি প্রবল প্রতাপশালী ছিলেন। কিন্তু অপুত্রক অবস্থায় তিনি কালকবলিত হইলে তাঁহার ভগিনীপতি উৎকলের সিংহাসন অধিকার করেন।

উৎকল দেশের দক্ষিণ প্রান্তে চন্দ্রবংশীয় রাজা উঢ়গঙ্গ * রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ শ্রীরাজরাজদেব † কনিষ্ঠ অনিয়ঙ্কভীমদেব। শ্রীরাজরাজদেব স্বপ্নেশ্বরের ভগিনী সুরমা দেবীকে বিবাহ

---

* বিকৃত নাম চোরগঙ্গ বা চোরংদেব। † ইং. তহাসে রাজেশ্বরদেব।

করিয়াছিলেন। স্বপ্নেশ্বরের মৃত্যুর পর তিনি উৎকল সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু তাঁহার কোন পুত্র সন্তান জন্মে নাই। সুতরাং রাজরাজ দেবের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা অনিয়ঙ্ক ভীমদেব উৎকল সিংহাসনারূঢ় হইয়াছিলেন (১০৯৬ শকাব্দ)। উড়িয়াদিগের উচ্চারণ ক্ষমতার ন্যূনতা-হেতু প্রবল প্রতাপ গজপতি, রাজাদিগের চূড়ামণি "অনঙ্গ ভীম" নামে ইতিহাসে পরিচিত হইয়াছেন। কিন্তু শাসনপত্রে তাঁহার নাম স্পষ্টাক্ষরে অনিয়ঙ্কভীম ক্ষোদিত রহিয়াছে।

অনিয়ঙ্ক ভীমদেব প্রথমতঃ যাযপুর ও চৌদুয়ার নগরে বাস করিতেন। পরে তিনি কটক নগরীর পশ্চিমোত্তর প্রান্তস্থিত "বারবাটী" নামক স্থানে রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি ফিরোজসাহের ন্যায় রাজ্যের শোভা সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি ও লোকহিতৈষিতার পরিচয় স্বরূপ অনেক সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে তিনি ৬০টী প্রস্তর নিম্মিত দেবমন্দির, দশটী সেতু, ও দেড় শত ঘাট নির্ম্মাণ করেন। তিনি চল্লিশটী বাপী ও এক কোটী পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পরিপূর্ণ ৪৫০ খানা গ্রাম সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

এই সময় উৎকলসীমা অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল; ইহার দুইটী কারণ দৃষ্ট হইতেছে। একটি বাহুবলে বিজয়, অন্যটি দক্ষিণ উৎকলের অধিপতি চন্দ্রবংশীয়দিগের সহিত উত্তর উৎকল ও তাম্রলিপ্তপতি গঙ্গারাঢ়ীয় বংশের সংযোগ। শ্রীরাজরাজদেবের পরিণয় কার্য্য দ্বারা এই সংযোগ হইয়াছিল। অনিয়ঙ্ক ভীমদেব বাহুবলে সেই সংযোগের ফল ভোগ করিয়াছিলেন।

বীর শ্রীগজপতি গৌড়েশ্বর নবকোটীকর্ণাটোৎকল বর্গেশ্বরাধিরায় ভূত-ভৈরবদেব সাধু শাসনোৎকর্ণ রাউৎরায় অতুলবলপরাক্রম সংগ্রাম-সহস্রবাহু ক্ষত্রিয়কুলধূমকেতু রাজাধিরাজ শ্রীঅনিয়ঙ্ক ভীমদেব জগন্নাথ দেবের প্রাচীন মন্দিরের সন্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে সামন্ত নরপতি ও রাজ্যের প্রধানবর্গকে সম্বোধন করিয়া (১১০৮ শঃ) বলিয়াছিলেন।—হে রাজপুত্র ও সামন্তবর্গ! রাজ্যশাসন, আয়, ব্যয়, সৈন্য দিগের বেতন, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যয় ও কোষাগার সম্বন্ধে আমি যে নীতি অবলম্বন করিয়াছি, তাহা আপনারা শ্রবণ করুন, আমি যে উপদেশ প্রদান করিতেছি তাহাতে মনোনিবেশ করুন। আপনারা অবগত আছেন, যে কেশরীবংশীয় রাজাগণ উত্তরে কাঁশবাঁস ও দক্ষিণে ঋষিকুল্যা, পূর্ব্বে সাগর

পশ্চিমে ভীমনগরের দণ্ডাপাট এই চতুঃসীমার মধ্যে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজস্ব ১৫ লক্ষ স্বর্ণমার ছিল। জগন্নাথদেবের আশীর্ব্বাদে গঙ্গাবংশীয় নরপতিগণ ক্ষত্রিয় ও ভৌমিকদিগকে জয় করিয়া নিম্ন লিখিত স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। উত্তরে কাঁশবাঁস হইতে বড়দাঁতই নদী মধ্যস্থিত স্থান,* দক্ষিণে ঋষিকুল্যা হইতে রাজমহেন্দ্রীর দণ্ডাপাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশ, পশ্চিমে বোদ ও সোনপুরের শেষ সীমা পর্য্যন্ত ভূভাগ। এই সকল স্থান হইতে ২০ লক্ষ মার অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় হইতেছে। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ের উৎকলরাজের রাজস্ব সর্ব্বশুদ্ধ ৩৫০০০০০ লক্ষ মার (২৮০০০০০০টাকা)! এই অর্থের কিয়দংশ সামন্ত (সেনাপতি), গজসৈন্য, রাউৎ (অশ্বারোহী) প্রভৃতির বেতন, ব্রাহ্মণ ও দেব সেবার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি। পাইক, সেবক ও অন্যান্য ভৃত্যদিগের ভরণ পোষণ জন্য ভূমি নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। হে রাজপুত্র ও সামন্তবর্গ! আপনারা আমার বন্দোবস্ত অবহেলা করিবেন না। নিশ্চয় বলিতে পারি আমি যাহাদিগের যে বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়াছি, তাহা লঙ্ঘন করিলে শাস্ত্রানুসারে আপনাদিগকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। আমার সর্ব্বপ্রধান উপদেশ এই যে, রাজ্য শাসনকালে প্রজাদিগের প্রতি ন্যায়বান ও দয়ালু হইবেন। নির্দ্ধারিত নিয়ম অনুসারে কর আদায় করিবেন। আমি সৌভাগ্য বশতঃ এবং যত্ন দ্বারা ৪০ লক্ষ স্বর্ণ মার (৩২০০০০০০ টাকা) ও ৭৮৮০০০ স্বর্ণমার মূল্যের মণি মুক্তা সংগ্রহ করিয়াছি। এক্ষণ আমার ইচ্ছা যে ইহার কতকাংশ একশত হস্ত উচ্চ একটি জগন্নাথদেবের মন্দির ও তাঁহার সাজ শয্যায় ব্যয়িত হউক। এই সম্বন্ধে আপনাদের অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করি। মন্ত্রী ও অমাত্যগণ উত্তর করিলেন যে এইরূপ সৎ ও শুভকার্য্য যত শীঘ্র আরম্ভ করা হয় ততই ভাল। মহারাজের বুদ্ধি বিবেচনার উপর তাহাদের পরামর্শ নিষ্প্রয়োজন। পরমহংস বাজপাই নামক জনৈক অমাত্যের উপর জগন্নাথের মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যের ভারার্পণ করা হইল। ১২৫০০০০ লক্ষ স্বর্ণ মার (১০০০০০০০ এককোটি টাকা) আড়াই লক্ষ মার মূল্যের মণিমুক্তা এই কার্য্যের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

জগন্নাথদেবের নুতন মন্দির প্রস্তুত হইলে তাহাতে জগন্নাথদেবকে স্থাপন করিয়া অনিয়ঙ্ক ভীম সেবক ও পূজকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

* ত্রিবেণীর ঘাট পর্য্যন্ত উত্তর সীমা বিস্তৃত ছিল।

তাঁহার দ্বারা জগন্নাথদেবের মন্দিরে ১৫ জন ব্রাহ্মণ ও ১৫ জন শূদ্র সেবক নিযুক্ত হইয়াছিল। তিনি ভোগ ও যাত্রার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

রাজা অনিরুদ্ধ ভীমদেব সমস্ত রাজ্য পরিমাপ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী দামোদর বড়পাণ্ডা ও ঈশান পট্টনায়কের তত্ত্বাবধারণে গঙ্গা হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত, সমুদ্র হইতে সোন সীমান্ত দেশ পর্য্যন্ত সমস্ত "নল" দ্বারা জরিপ করা হইয়াছিল। মোট ভূমি ৬২২৮০০০ বাটি হইয়াছিল। (৩৯৪০৭ বর্গমাইল)।

এই সময় উৎকলেশ্বরের পদাতি সৈন্য পঞ্চাশ সহস্র, দশ সহস্র অশ্বারোহী ও ২৫০০ সহস্র হস্তী ছিল। এতদ্ব্যতীত তিন লক্ষ পাইক ছিল। মহারাজাধিরাজ অনিরুদ্ধ ভীমদেব বিস্তৃত রাজ্যের শীর্ষস্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রবল প্রতাপে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া, জগন্নাথদেবের মন্দিররূপ কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। যতদিন জগন্নাথ দেবের বিশাল মন্দির বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন কেহই অনিরুদ্ধ ভীমদেবের নাম বিস্মৃত হইতে পারিবেন না।

রথযাত্রার সময়ে তিনটী রথ প্রস্তুত হইয়া থাকে। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা সেই তিনটী রথে আরোহণ করিয়া গুণ্ডিচা গৃহে গমন করেন। এক সপ্তাহান্তে তথা হইতে মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জগন্নাথের রথের নাম "নন্দীঘোষ" ইহা প্রায় ৩২ হস্ত উচ্চ, বলরামের রথ "তালধ্বজ" ইহা প্রায় ৩০ হস্ত উচ্চ, সুভদ্রার রথের নাম "পদ্মধ্বজ" ইহা প্রায় ২৮ হস্ত উচ্চ।

কালাপাহাড়ের অত্যাচার।

আইলা কলা পাহাড়।
ভাঙ্গিলা লোহার বাড়॥
খাইলা মহানদী পাণি।
স্বর্ণ থালিরে হেড়া, পশন্তি মুকুন্দঙ্ক রাণী॥

হিন্দু দেব দেবীর প্রতি অত্যাচার করা মুসলমানদিগের বড় গৌরবের বিষয় ছিল। মুসলমান শাসিত ভারতইতিহাসের প্রতিপৃষ্ঠায় এই অসভ্য জনোচিত অত্যাচারের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। অতি প্রাচীন কালে মুলতান নগরে সূর্য্যদেবের এক মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। মহম্মদ বিন কাসিম মুল-

স্তান নগরী জয় করিয়া সেই সূর্য্য দেবের কণ্ঠদেশে গোমাংশ হার বিলম্বিত করিয়াছিলেন। তৎপর সোমনাথের প্রতি সুলতান মহম্মদের অত্যাচার কাহিনী ইতিহাসপাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। ভারতে এইরূপ অসভ্যজনোচিত পৈশাচ অত্যাচার কত হইয়াছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে। জগন্নাথদেবের বিবরণ লিখিতে যাইয়া আমরা অদ্য ঐরূপ একটী অত্যাচার কাহিনী নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে পাঠকদিগের নিকট বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মোগলকুলচূড়ামণি আকবরের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে দীর্ঘকাল পাঠান জাতীয় স্বাধীন নরপতিগণ বাঙ্গলায় রাজ পতাকা উড়াইতেছিলেন। প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে এক বার প্রখর জ্যোতি বিস্তার করিয়া থাকে। অতীত সাক্ষী ইতিহাস আলোচনা দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, কোন কোন দেশের রাজকুলপ্রদীপ নির্ব্বাণ হইবার পূর্ব্বে এক এক বার অত্যন্ত উগ্র-জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছে। দাউদসাহ বাঙ্গলার স্বাধীন পাঠান নরপতিদিগের শেষ রাজা। তাঁহার পিতা সোলেমান সাহের শাসন কালে পাঠান বঙ্গেশ্বরদিগের সৌভাগ্য ভাস্কর অদৃষ্টাকাশের মধ্যস্থলে বিরাজ করিতেছিল। সোলেমান সাহ যখন মোগল সম্রাট আকবরের সহিত কলহের সূচনা করিতেছিলেন, সেই সময় আকবর সাহ উৎকলেশ্বরের সহিত সন্ধিবন্ধন দ্বারা এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, সোলেমান সাহ প্রকাশ্য-ভাবে মোগল সম্রাটের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলে উৎকলেশ্বর বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবেন।

এই ঘটনার পর বৎসর আকবর সাহ যৎকালে ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে সমর কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময় সোলেমান উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধ যাত্রায় রাজু (প্রকাশ্য নাম কালাপাহাড়) সেনাপতি হইয়াছিলেন। রাজু ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি কোন মুসলমান রাজকুমারীর প্রণয় পাশে বদ্ধ হইয়া পৈত্রিক ধর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুর্দ্দান্ত কালাপাহাড়ের উড়িষ্যা বিজয় বৃত্তান্ত এস্থলে সবিস্তারে লিখিবার প্রয়োজন নাই। পরিচ্ছেদের শীর্ষস্থিত গ্রাম্য কবিতাপাঠে প্রতীত হইবে যে, অদ্যাপি উড়িষ্যাবাসী সেই দুর্দ্দান্তের অত্যাচার বিস্মৃত হইতে পারে নাই। কালাপাহাড় সমস্ত উড়িষ্যা পদদলিত করিয়া যখন পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন, তখন পাণ্ডাগণ জগন্নাথ

দেবের মূর্ত্তি গোপনে মন্দির হইতে লইয়া গিয়া চিল্কা হ্রদের তীরবর্ত্তী পারিকুদ নামক স্থানে ভূগর্ত্তে লুকায়িত রাখিলেন। কালাপাহাড় এই সংবাদ অবগত হইয়া পারিকুদে গমন করিয়া জগন্নাথ মূর্ত্তি উদ্ধার পূর্ব্বক হস্তী পৃষ্ঠে স্থাপন করত বাঙ্গলায় যাত্রা করেন এবং গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া এক চিতা প্রস্তুত করিয়া জগন্নাথের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া আরম্ভ করেন। বিসার মাহান্তি নামক একব্যক্তি কৌশলক্রমে প্রজ্বলিত চিতা হইতে জগন্নাথের অর্দ্ধ দগ্ধ মূর্ত্তি উদ্ধার করিয়া উড়িষ্যায় লইয়া গেলেন। উড়িয়াগণ নিমকাষ্ঠ দ্বারা পুনর্ব্বার জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পুরীর মন্দিরে স্থাপন করিলেন।

এই ঘটনার পর অদ্যপর্য্যন্ত আর কোন ও বিধর্ম্মী জগন্নাথের প্রতি কোন রূপ অত্যাচার করেন নাই। মোগল শাসন কালে রাজা তোড়লমল্ল ও মানসিংহ প্রভৃতি মহাত্মাগণ দ্বারা জগন্নাথের সেবা পূজার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে।

মোগলদিগের পর মারহাট্টাগণ উড়িষ্যা অধিকার করেন। সুতরাং তাঁহাদের শাসন কালে জগন্নাথ দেবের মহিমা প্রচারের কোন রূপ বিঘ্ন হইতে পারে নাই। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা প্রথম ব্রিটনীয়ার লোহিত রেখায় রঞ্জিত হয়। ইংরাজ কোম্পানী প্রথমতঃ অর্থলোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া জগন্নাথ যাত্রীদিগের নিকট হইতে শুল্ক গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পশ্চাৎ মিসনারীদিগের টিট্‌কারীতে জ্বালাতন হইয়া ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট হৃতরাজ্য খোর্দ্দাপতিকে জগন্নাথের মন্দিরের সমস্ত ভারার্পণ করিয়াছিলেন। সেই হইতে খোর্দ্দাররাজগণ পুরীর রাজা বা ঠাকুর রাজা নামে খ্যাত হইয়াছেন। বিবেচনা করিতে গেলে ইহাই প্রতীত হইবে যে এই ঠাকুর রাজ জগন্নাথের "মহান্ত" ব্যতীত আর কিছুই নহেন।

জগন্নাথের মন্দিরে একটী নিতান্ত জঘন্য ও কুপ্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। জগন্নাথের কয়েকটি উপপত্নী বা রক্ষিত বেশ্যা আছে। ইহারা রাজপ্রদত্ত জায়গীর ভোগ করিয়া আসিতেছে। কোন্ সময় হইতে যে এই কুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা আমরা অবগত নহি। আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি অপরাহ্ন ও নিশীথ সময়ে এক এক জন বেশ্যা জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করিলে দ্বার বন্ধ হইয়া যায়। মোগল সম্রাট ঔরংজীবের শাসনকালে [ফরা]সী ভ্রমণকারী বর্ণিয়ার যখন ভারত ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন

তিনি পুরীতে যাইয়া এই জঘন্য প্রথা দর্শন করিয়া সমস্ত হিন্দুজাতিকে ধিক্কার দিয়া গিয়াছেন। আমরা বেশ্যাকে গোপনে জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশ করিতে দর্শন করিয়া পাণ্ডাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পাণ্ডা বলিলেন যে, ঐ বেশ্যা মন্দিরে যাইয়া কেবল গীতগোবিন্দ গান করিয়া থাকে।

মধ্যকালে ব্রাহ্মণদিগের কৃপায় জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে যে লোমহর্ষণ কাণ্ডের অভিনয় হইত তাহার উল্লেখ করিয়া আমরা গ্রন্থ শেষ করিব। যে বুদ্ধদেব "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, সেই মহাত্মার রথযাত্রা উপলক্ষে এক সময়ে কত নরহত্যা হইত, তাহা স্মরণ করিলে ও শরীর রোমাঞ্চিত হয়, হৃদয়ের শোণিত উত্তপ্ত হইয়া শীরায় শীরায় ধাবিত হইতে থাকে। আমরা বাল্যকালে দিদিমার নিকট যে রূপ কামনা সাগরে প্রাণত্যাগের গল্প শ্রবণ করিয়াছি, এক সময় পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণদিগের কৃপায় জগন্নাথের রথচক্র ও সেই রূপ কামনা সাগর হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকেই নানাবিধ কামনা করিয়া জগন্নাথের রথের অগ্রে শয়ন করিয়া থাকিত, আর নৃশংস পাণ্ডাগণ সেই ব্যক্তির উপর দিয়াই রথ টানিয়া লইয়া যাইত। প্রত্যেক বর্ষে রথযাত্রা উপলক্ষে এইরূপ ২০। ২৫টী নরহত্যা হইত। ফরাসী ভ্রমণ কারী বর্ণিয়ার এই সকল লোমহর্ষণ কাণ্ড দর্শন করিয়া নিতান্ত আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ডাক্তর বকনন্ রথযাত্রা দর্শনাভিলাষে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিয়া এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড দর্শনে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কৃপায় এই নৃশংস প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ পাণ্ডাদিগের অন্যান্য প্রকার অত্যাচার ব্যতীত এক্ষণে আর জগন্নাথ ক্ষেত্রে অন্য কোন প্রকার নৃশংস প্রথা প্রচলিত নাই।

যে সকল হিন্দু সন্তান জগন্নাথ দর্শনার্থ গমন করিয়া থাকেন আমরা তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিতেছি, যে, তাঁহারা যেন পাণ্ডাদিগের কুহকে পড়িয়া "আটিকা বন্ধন" বাবত পাণ্ডাদিগকে এক কপর্দ্দক ও না দেন। যাত্রীদিগের রক্ত শোষণ করিয়া আপনাদের বিশাল উদর পরিপূর্ণ করিবার জন্য পাণ্ডাদিগের ইহাই প্রধান কৌশল।

যুবতী স্ত্রীলোক বিশেষতঃ বিধবা যাত্রীদিগকে আমরা বলিতেছি, তাঁহারা জগন্নাথ প্রদক্ষিণকালে বিশেষ সতর্ক হইবেন। জগন্নাথের পশ্চাৎ দিকটা বড়ই অন্ধকার।

সমাপ্ত।